ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো ‘পরে
Love for All
Hatred for None

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ২২তম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ | ২৩ শাবান, ১৪৩৭ হিজরি | ৩১ হিজরত, ১৩৯৫ হি. শা. | ৩১ মে, ২০১৬ ঈসাব্দ

গত ২০ মে, ২০১৬ নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা’তের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) সুইডেনের গোথেনবার্গে অবস্থিত ‘নাসের মসজিদ’-এ জুমুআর খুতবা প্রদান করেন

খুতবার সংক্ষিপ্তরূপ পড়ুন ৪৬ পৃষ্ঠায়

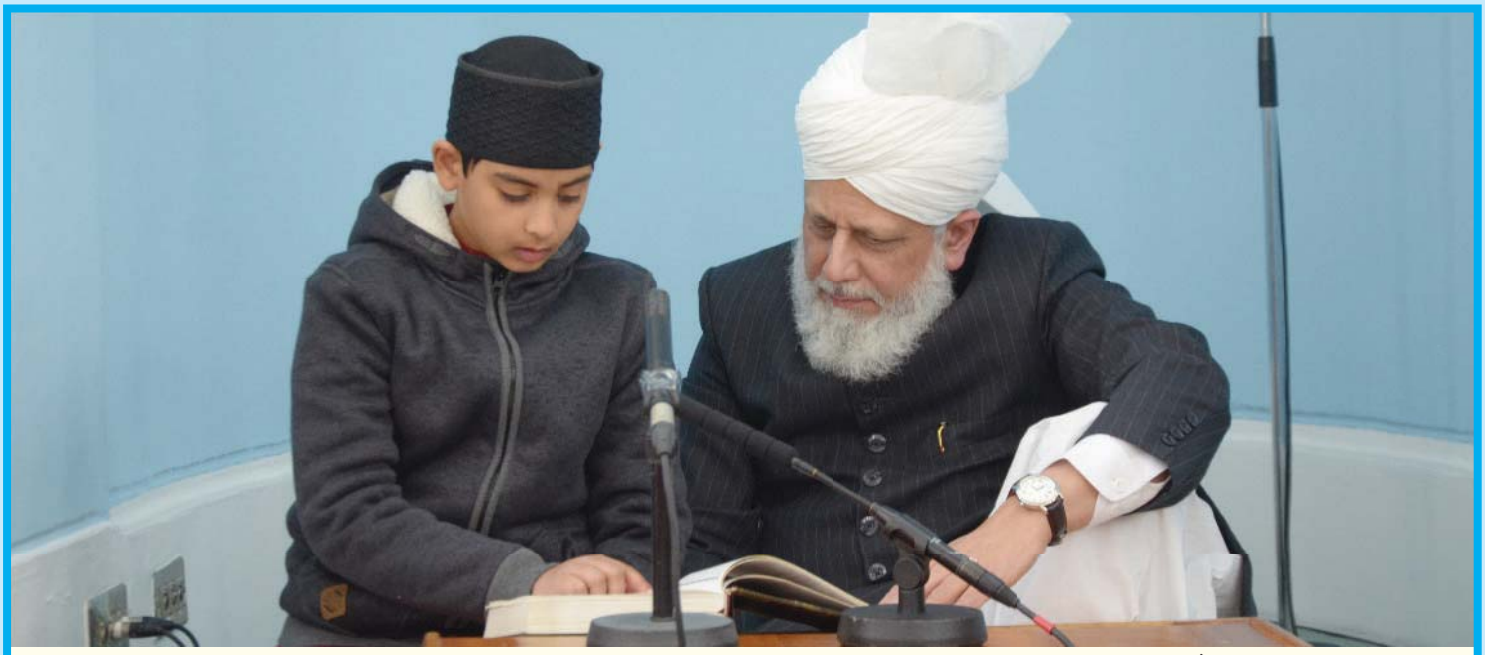

গত ১০ই এপ্রিল ২০১৬ লন্ডনের ফযল মসজিদে জনাব আহমদ তারেক মুবাশ্বের সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র তাহের আহমদ মুবাশ্বের-এর আমীন করান হুযূর আনোয়ার (আই.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)** রচিত **'আল্ ইস্তিফতা'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

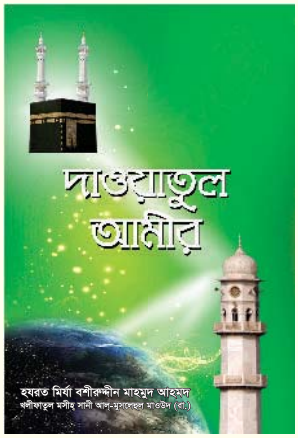

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."
Hakim Watertechnology
"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000,Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

পবিত্র মাস রমযান আগত আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের পূর্ব প্রস্তুতি

আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় আমরা শাবান মাস অতিক্রম করছি আর কিছু দিন পরই শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র মাস রমযান। মু'মিন-মুত্তাকি বান্দারা এই মাসটির অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকে আর নিজেকে এমন ভাবে প্রস্তুত করে যাতে পূর্বের রমযান থেকে এবারের রমযানে আল্লাহ্‌র নৈকট্য কামনায় আরো বেশী নেক আমল ও ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভ করতে পারে।

হযরত রাসূল করীম (সা.) প্রতি মাসে নফল রোযা রাখতেন আর রমযানের পূর্বে শাবান মাসে অধিক সংখ্যায় নফল রোযা রাখতেন সেই সাথে অনেক বেশি ইবাদত করতেন, আমাদেরও উচিত, তাঁর (সা.) সুন্নত মান্য করে চলা।

গত রমযানে যদি মাত্র একবার পবিত্র কুরআন খতম দিয়ে থাকে তাহলে এবার ইচ্ছা রাখে অন্তত: দু'বার সেই স্বাদ গ্রহণের। বাহ্যিকভাবে শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ভাল ফলাফলের চিন্তায় মগ্ন থাকে তেমনি যারা মু'মিন রমযানকে স্বাগত জানানোর জন্য আগে ভাগেই তারা তৈরী হয়ে থাকে। রমযানের দিনগুলো কিভাবে কাটাবে খোদার সান্নিধ্য লাভে কিভাবে নিজেকে নিবেদন করবে যাতে খোদা তা'লা দোয়া কবুল করেন এবং সুস্থ্য রেখে রমজানে ইবাদত করতে সাহায্য করেন।

আল্লাহ্ তা'লার সমীপে সকরুণ নিবেদন, হে খোদা! তুমি আমাদের সুস্থ্য রাখ যেন আগত রমযানে পুর্বের তুলনায় অনেক বেশী ইবাদত-বন্দেগী, দান-খয়রাত, কুরআন পাঠসহ পুণ্য কর্মে বেশী অগ্রসর হতে পারি। গত বছরের তুলনায় ইবাদতে অধিক রত থেকে তোমার পবিত্র দর্শন লাভে কল্যাণমন্ডিত হতে পারি।

রমযানের প্রস্তুতি না নিলে দেখা যাবে ফরয নামায নফল ইবাদতে আর অনেক নেক কর্মে অংশ নিতে পারছি না। আর এভাবে ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে রমযান মাস অতিবাহিত হয়ে যাবে, পরে আফসোস করা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।

তাই এখন থেকেই যদি সবাই সচেতন হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজগুলো গুছিয়ে নেয়া হয় তাহলে তারাবিহ্‌র নামায এবং দারসে অংশ নিতে ব্যাঘাত হবে না। এভাবে যে কেউ যে অবস্থানেই থাকুক না কেন, এখন থেকেই যদি নিজেকে রমযানের জন্য প্রস্তুত করা হয় তবে রমযানের রাতগুলো ইবাদতের সৌন্দর্যে মোহনীয় হয়ে ওঠবে।

হযরত রাসূল করীম (সা.) প্রতি মাসে নফল রোযা রাখতেন আর রমযানের পূর্বে শাবান মাসে অধিক সংখ্যায় নফল রোযা রাখতেন সেই সাথে অনেক বেশি ইবাদত করতেন, আমাদেরও উচিত, তাঁর (সা.) সুন্নত মান্য করে চলা। আমরা আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর তাহরীক অনুযায়ী প্রতি মাসে কয়েকটি নফল রোযা রাখবার সৌভাগ্য লাভ করে চলছি। কাজেই রোযার সাথে দোয়া ও ইস্তেগফারের কল্যাণ লাভে আমাদের সবার উচিত নিজেকে পরিপূর্ণভাবে রমযানের জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তোলা।

মহান খোদা তা'লা আমাদের সকলকে সুস্থ্যতার সাথে এবং তাঁর ইবাদতে রত থেকে পবিত্র মাহে রমযানের দিনগুলো কাটানোর তৌফিক দান করুন, আর তাঁর নৈকট্যের চাদরে আমাদের ঠাঁই দিন, আমিন।

সূচিপত্র

৩১ মে, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া'
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ৬

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২৯ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ৯

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ১৭
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২২ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ১৯

আহমদীয়া খিলাফত মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লার তেজোদীপ্ত ঐশী শক্তির মহিমাপূর্ণ বিকাশ-স্থল ২৫
মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

শবে বরাত ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে আদৌ কোন গুরুত্ব রাখে কী? ৩১
আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ

আসুন, পবিত্র রমযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করি ৩৩
মাহমুদ আহমদ সুমন

কলমের জিহাদ ৩৫
মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

খিলাফত দিবস ও ঐশী খিলাফতের কল্যাণ ৩৭
মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস ৩৮
মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

পাঠক কলাম– ৪০
"বিশ্বের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে প্রকৃত মুসলমানের করণীয়।"
আনোয়ারা বেগম, মুয়ায্‌যেম আহমদ সানী,
মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ

সংবাদ ৪৩

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৬

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকী ৪৭

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৪৮

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّهُوَ كَظِيْمٌ ﴿۵۹﴾

৫৯। অথচ তাদের কাউকে যখন কন্যাসন্তান (জন্ম হওয়ার) সংবাদ দেয়া হয় তখন দুঃখে তার মুখ কালো হয়ে যায়[১৫৫২-ক] এবং সে (তার) মনোকষ্ট চেপে রাখে।

يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ ﴿۶۰﴾

৬০। যে সংবাদ তাকে দেয়া হয়েছে এর কষ্টে সে মানুষের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়ায় (আর ভাবে) লাঞ্ছনার (সম্মুখীন হওয়া) সত্ত্বেও তাকে কি সে বাঁচিয়ে রাখবে নাকি তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে[১৫৫৩]? সাবধান! তারা যে সিদ্ধান্ত নেয় তা অতি জঘন্য।

لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰى ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۶۱﴾ ع ۱۳

৬১। যারা পরকালে বিশ্বাস রাখে না তাদের জন্য নিকৃষ্টতম দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। শুধু আল্লাহ্‌রই জন্য মহোত্তম দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।

১৫৫২-ক। 'ইসওয়াদ্দা ওয়াজহুহু' অর্থ ঃ তার মুখ কালো হয়ে গেল, তার মুখমণ্ডল বিষন্নতায় ছেয়ে গেল, সে ব্যথিত, দুঃখিত বা হতবুদ্ধি হলো, সে অপমানিত হলো (লেইন)।

১৫৫৩। আরবদের কোন কোন উপজাতির মধ্যে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে জীবন্ত কবর দিয়ে ফেলা হতো। এই আয়াত সেই পৈশাচিক, বর্বর ও অমানবিক প্রথার প্রতি ইঙ্গিত করেছে। তারা (আরবরা) তাদের নারী গোষ্ঠীর প্রতি অত্যন্ত নীচ ধারণা পোষণ করতো এবং চরম নিম্নস্তরে ছিল নারীর অবস্থান। কুরআন করীম নারীর সম্মানজনক মর্যাদাকে দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেছে এবং তাদের সকল ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি দিয়েছে। এই বিষয়েও পৃথিবীর সকল ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কুরআন অনুপম ও অদ্বিতীয়।

হাদীস শরীফ

আনুগত্য ব্যতিত কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে না

কুরআন ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর এবং তাদেরও আনুগত্য কর, যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেয়ার অধিকারী।" (সূরা আন্ নিসা : ৬০)

আজ দুনিয়াতে কোটি কোটি মুসলমান আছে কিন্তু সবাই এক কান্ডারিহীন নৌকার মত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঠিক এমনি অবস্থায় হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে মুসলমানদের এক রজ্জুতে একত্রিকরণ বলে তিনি (সা.) বর্ণনা করেছেন।

হাদীস ঃ

হযরত ইবাদা ইব্নে সামেত (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা হযরত রসূল করীম (সা.) এর হাতে এই বলে বয়আত করেছি যে, আমরা প্রত্যেক অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব যদিও আমরা কষ্টে থাকি অথবা ভাল অবস্থায় থাকি, যদিও কোন আদেশ আমাদের ভালো মনে হয় অথবা মন্দ, যদিও আমাদের প্রাধান্য দেয়া হয় অথবা বঞ্চিত রাখা হয়। যাদের হাতে আমাদের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, আমরা তাদের সাথে ঝগড়া করব না। (বুখারী)

ব্যাখ্যা ঃ

জাতির উন্নতিতে আনুগত্য গুরুত্বপূর্ণ এক ভূমিকা পালন করে থাকে। ইহা ব্যতিরেকে কোন জাতি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছতে পারে না। কথায় কথায় নেতার বিরোধিতা জাতির প্রগতির ধারাকে শিথিল করে দেয়। নেতার ওপর ভরসা ও তাঁর আদেশ পালনের মধ্যে উন্নতির চাবি-কাঠি নিহিত। এই দুনিয়াতে যতগুলি জাতির উত্থান হয়েছে তার রহস্য হলো আনুগত্য। সুতরাং এই আনুগত্য যেভাবে জাগতিক ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয়, তদ্রুপ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মত যতদিন নিজেদের মধ্যে আনুগত্যকে প্রাধান্য দিয়েছে ও একে প্রতিষ্ঠিত ও বাস্তবায়িত করেছে, ততদিন বিজয় তাদের পদ চুম্বন করেছে, দুনিয়ার বড় বড় শক্তিগুলি তাদের কাছে পরাভূত হয়েছে। কিন্তু যেদিন মুসলমানগণ ছিন্ন ভিন্ন হলো এবং আনুগত্য করা ভুলে গেল, সেদিন থেকে তারা পরাস্ত হতে লাগলো।

আজ দুনিয়াতে কোটি কোটি মুসলমান আছে কিন্তু সবাই এক কান্ডারিহীন নৌকার মত। হযরত মুহাম্মদ (সা.) ঠিক এমনি অবস্থায় হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.)-এর আগমনের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং তাঁর আগমনের মুখ্য উদ্দেশ্য হবে মুসলমানদের এক রজ্জুতে একত্রিকরণ বলে তিনি (সা.) বর্ণনা করেছেন।

আজ খোদা তা'লার ফযলে পৃথিবীর ২০৮টি দেশের আহমদীগণ এক নেতার নেতৃত্বে ইসলামের বিজয়ের পথকে সুগম করেছে। এই বিজয়ও একমাত্র আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল।

আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের সকলকে আনুগত্যের মধ্যে জীবন যাপন করার তৌফিক দান করেন, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

কুরআনের মহিমা সকল মহিমার উর্ধ্বে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

পবিত্র কুরআন এক অদ্বিতীয় ধন-ভান্ডার, কিন্তু স্বল্প সংখ্যক লোক এ সম্বন্ধে জ্ঞাত রয়েছে।

(রূহানী খাযায়েন, দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)

কুরআনের মহিমা সকল মহিমার ঊর্ধ্বে। এটা বিচারক ও সকল হেদায়াতের সমষ্টি। এটা সকল প্রমাণকে একত্রিত করে দিয়েছে এবং শত্রুর দলকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। এ পুস্তকে সকল বিষয়ের বিবরণ আছে এবং পূর্বের ও ভবিষ্যতের সংবাদও রয়েছে। এ মহাগ্রন্থের সামনে দাঁড়ানোর সাহস নেই, আর আড়াল থেকেও কেউ একে আক্রমণ কারো করতে পারে না। বরং এটা তো আমাদের প্রভুর জ্যোতি।

(রূহানী খাযায়েন, ১৬ খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা)

কুরআন শরীফ এমন এক নিদর্শন, যার দৃষ্টান্ত পূর্বেও ছিল না, পরেও হবে না। এর কল্যাণ ও বরকতের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। এটা প্রত্যেক যুগে অনুরূপভাবে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল, যেভাবে হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল।

জানা আবশ্যক যে, কুরআন শরীফের উজ্জ্বল অলৌকিক-নিদর্শন, যা প্রত্যেক জাতি ও ভিন্ন ভাষাভাষীর জন্য প্রকাশ করতে পারে, যা পেশ করে আমরা সকল দেশের অধিবাসীদের- যদিও বা তারা হিন্দু, পারসি, ইউরোপীয়ান, আমেরিকান অথবা অন্য কোন দেশেরই হোক না কেন- অপরাধী, স্তব্ধ ও নিরুত্তর করতে পারি। কুরআন করীমের তত্ত্ব, সত্যতা ও সত্য তথ্যাদির জ্ঞান এত অসীম, যা প্রত্যেক যুগে এর প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকাশ হয়ে থাকে এবং এটা প্রত্যেক যুগের ভ্রান্ত ধারণার বিরুদ্ধে অস্ত্র-সজ্জিত সৈনিকের ন্যায় দন্ডায়মান। যদি কুরআন শরীফ নিজ সত্য তথ্যাদি ও সুস্থতার এক সীমিত-বস্তু হত, তা হলে এটা কখনও পূর্ণ-নিদর্শন হতে পারত না।

(রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খণ্ড, ২৫৫ পৃষ্ঠা)

কুরআন শরীফ এমন এক নিদর্শন, যার দৃষ্টান্ত পূর্বেও ছিল না, পরেও হবে না। এর কল্যাণ ও বরকতের দ্বার সর্বদা উন্মুক্ত। এটা প্রত্যেক যুগে অনুরূপভাবে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল, যেভাবে হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর যুগে ছিল। এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বাণী তার প্রকৃতি অনুপাতে হবে, যেরূপ তার মনোবল, সংকল্প ও উদ্দেশ্য উচ্চ হবে। যে ব্যক্তির প্রতি তাঁর ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয়, তার প্রকৃতি যত উৎকৃষ্ট হবে, ঐশী বাণীও সে সেই পর্যায়ের লাভ করবে। হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রকৃতি, যোগ্যতা ও সংকল্পের পরিধি যেহেতু ব্যাপক ছিল, তাই তিনি যে বাণী পেয়েছেন সেটাও সেরূপ উচ্চ- মর্যাদা ও গুণাবলী সম্পন্ন যে, এরূপ বৈশিষ্ট্য বা মনোবলের অধিকারী ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি আর কখনও হবে না।

(রূহানী খাযায়েন, তৃতীয় খণ্ড, ৫৭ পৃষ্ঠা)

আমি সত্য সত্যই বলছি এবং সত্য কথা বলা হতে বিরত থাকতে পারি না যে, যদি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম না আসতেন এবং কুরআন শরীফ অবতীর্ণ না হত- যে কুরআন শরীফের কার্যকারিতা আমাদের ইমামগণ ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ আদি হতে দেখে আসছেন এবং আজ আমরাও দেখছি, তা হলে এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত দুষ্কর বিষয় হত যে, আমরা শুধু বাইবেলকে পড়ে আস্থার সাথে সনাক্ত করতে পারতাম যে, হযরত মূসা, হযরত মসীহ্ এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী নবীরাও প্রকৃতপক্ষে সেই পাক ও পবিত্র জামা'তেরই অন্তর্ভুক্ত, যাদের খোদা তা'লা নিজের বিশেষ কৃপায় নিজ রেসালতের জন্য বেছে নিয়েছেন।

'ফুরকানে মজীদের' এই অনুগ্রহ স্বীকার করে নিতে হবে যে, প্রত্যেক যুগে এটা স্বীয় জ্যোতি নিজেই দেখিয়েছে এবং এই পূর্ণ জ্যোতি দ্বারা পূর্ববর্তী নবীদের সত্যতাও আমাদের ওপর প্রকাশ করেছে। এ অনুগ্রহ শুধু আমাদের ওপরই নয়, বরং আদম হতে মসীহ্ পর্যন্ত সে সব নবীদের উপরেও, যাঁরা কুরআন শরীফের পূর্বে গত হয়েছেন।

(রূহানী খাযায়েন, প্রথম খণ্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা)

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)
আহমদীয়া মুসলিম জামা’ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

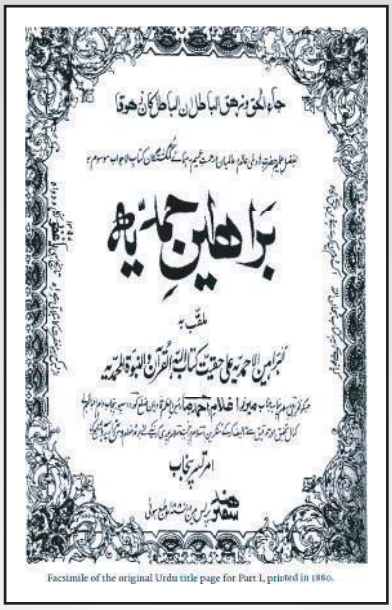

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

(১৭তম কিস্তি)

অতএব কুরআন শরিফের নাযিলকর্তা যদি খোদা না হয়ে থাকেন, কীভাবে এতে সমগ্র বিশ্বের ঐশী সত্য ও সত্যিকার ঐশী জ্ঞানসমৃদ্ধ বিষয়াদি লিপিবদ্ধ হলো? আর ঐশীজ্ঞান সংক্রান্ত সে সকল উৎকর্ষ যুক্তি ও প্রমাণাদি, যা পুরোপুরি ও যথাযথভাবে লিখতে সকল যুক্তিবিদ ও দার্শনিকগণ অপারগ ছিল এবং যারা নিরন্তর ভ্রান্তিতে ক্রমঃনিমজ্জমান অবস্থাতেই ভবলীলা সাঙ্গ করেছে, তা কোন্ সে অনন্য-অতুলনীয় দার্শনিক যে কুরআন শরীফে তা লিপিবদ্ধ করেছে? সেই সুমহান যুক্তিসমৃদ্ধ বক্তৃতাগুলো একজন দরিদ্র নিরক্ষরের ওষ্ঠাধর থেকে নিঃসৃত হয়েছে, যার পবিত্র ও প্রদীপ্ত প্রমাণাদি দেখে অহংকারী গ্রীক ও ভারতীয় প্রাজ্ঞদের লজ্জায় মরে যাওয়ার কথা–অবশ্য যদি লজ্জা থাকে। সত্যতার এত প্রমাণ পূর্বের নবীদের মাঝে কোথায়? আজ পৃথিবীতে এমন গ্রন্থ কোথায় যা এ সকল ক্ষেত্রে কুরআন শরীফের সামনে দাঁড়াতে পারে?

মহানবী (সা.)-এর জীবনে সংঘটিত ঘটনাবলী যা আমরা উল্লেখ করেছি, তা মহানবীর মত অন্য কোন নবীর ক্ষেত্রে ঘটেছে কি? বিশেষ করে বেদের যে সকল ইলহামপ্রাপ্ত ঋষিদের কথা বলা হয় তাদের সত্যতার কোন প্রভাবতো দূরের কথা, বাস্তবে যে তাদের কোন অস্তিত্ব ছিল, একথাটুকুই প্রমাণ হয় না। সাথীগণ! যদি আপনাদের মতে ইনসাফ বলতেও কোন কিছু আছে আর বিবেক নামের কোন মূল্যবান জিনিসও রয়েছে। সুতরাং সত্য ও সততার এমন প্রমাণ হয়ত নিজেদের গ্রন্থ থেকে বের করে দেখাও, পুরো কুরআন হলো যার সমাহার, আর যা আমরা প্রথম অধ্যায় থেকে লেখা আরম্ভ করবো বা লজ্জাবোধের প্রমাণ দাও আর বড় বড় বুলি আওড়ানো পরিহার করো। যদি কিছুটা খোদাভীতি থাকে এবং মুক্তির কোন বাসনা থাকে তাহলে ঈমান আন। এখন এই মুখবন্ধ লেখা শেষ হলো আর আমরা প্রারম্ভিক কথা যা বলতে চেয়েছি তা লিখেছি এরপর গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় আরম্ভ হবে।

কুরআন ও মহানবীর নবুওয়তের সত্যতার প্রমাণাদি বিস্তারিত ও বিশদভাবে বর্ণনা করা হবে। সে সকল প্রমাণাদি স্বয়ং কুরআন থেকে বের করে দেখানো হবে যার সত্যতার উন্নত মানকে দৃষ্টিতে রেখে দশ হাজার টাকার বিজ্ঞাপন এ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যুক্তিগত প্রমাণ উপস্থাপনের এই রীতি যার ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে ঐশী গ্রন্থের ওপর রাখা হয়েছে, তা আমাদের মাঝে ও আমাদের

বিরোধীদের মাঝে এমন একটি পরিস্কার সিদ্ধান্ত যা সকল বিবেকবানের দৃষ্টি উন্মোচনের জন্য যথেষ্ট। আর এমন একটি পথ-প্রদর্শক আলো, যার মাধ্যমে মিথ্যাবাদী ও সত্যবাদীদের মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

সুতরাং হে ইসলামের অস্বীকারকারীগণ! যদি এখনও কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে আপনাদের কোন আপত্তি থাকে বা যদি এর শ্রেষ্ঠত্ব গ্রহণে কোনরূপ দ্বিধা থাকে তাহলে আপনাদের স্ব-স্ব ধর্মগ্রন্থ হতে যুক্তির ভিত্তিতে এর উত্তর প্রদান করা আপনাদের জন্য আবশ্যক। নতুবা আপনারা জানেন আর সকল ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিও জানে, যে গ্রন্থের সত্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব শতশত যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত, এর প্রমাণাদি খন্ডন না করে আর পরাকাষ্ঠায় এর সমমর্যাদার গ্রন্থ উপস্থাপন না করে কুরআনকে মানুষের বানানো গ্রন্থ মনে করা এবং এর অবমাননা করা, এমন একটি অন্যায় কাজ যা লজ্জাবোধ ও পবিত্র চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণভাবে পরিপন্থী বিষয়। আর এখানে আমরা একথাও পরিস্কার করে বলতে চাই, যে ব্যক্তি এই পুস্তক প্রকাশের পর সৎ লোকদের ন্যায় এর প্রমাণাদি খন্ডনের প্রতি মনোযোগ দেয়ার পরিবর্তে সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার জন্য অনর্থক নিজেদের পুস্তিকা, পত্রিকা, বক্তৃতা ও রচনায় ইসলামের পবিত্র ঝর্ণাকে ঘোলাটে আখ্যা দেয় বা নিজেদের ঘরে (বসে) ইসলামী শিক্ষাকে আপত্তিকর শিক্ষা আখ্যায়িত করে; এমন মানুষ খৃষ্টান হোক বা হিন্দু, ব্রাহ্মসমাজী হোক বা অন্য কেউ, তাদের এ কাজকে সততা ও পবিত্রতার পরিপন্থী গণ্য করা হবে।

কেননা যেখানে কুরআনের ঐশী বাণী হওয়া ও এর সত্যতা আমরা অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে প্রমাণ করেছি আর অদূরদর্শী ও দুর্বল ধ্যান-ধারণা সম্পন্ন লোকদের সকল আপত্তি খন্ডন ও দূরীভূত করা হয়েছে এবং নিরঙ্কুশ প্রমাণ বা ব্যবস্থা হিসেবে আমার যুক্তি খন্ডনকারীদের বড় অংক দেয়ার প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়েছিল। অর্থাৎ যদি তারা নিশ্চয়তা চান তাহলে সরকারীভাবে সত্যায়িত প্রতিশ্রুতিও আমাদের নিকট হতে আদায় করতে পারেন। আমাদের এমন সততা ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও যদি এখনও কোন ব্যক্তি বিতর্ক ও মুনাযিরার এই সোজা পথ অবলম্বন না করে আর এই গ্রন্থের উত্তর না দিয়ে অজ্ঞ, ছেলে-পেলে ও সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য ইসলামের ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে, সেখানে এছাড়া আর কি বলব যে, তার দুরভিসন্ধি রয়েছে আর তার স্বভাব খারাপ; অথচ এক্ষেত্রে জয়যুক্ত হলে এ পরিমান অর্থ অনায়াসে তার হস্তগত হতে পারে।

সাথীগণ! বিদ্বেষ পরিহার কর আর সত্য গ্রহণ কর। আস খোদাকে কিছুটা হলেও ভয় কর। এই ইহজগত ক্ষণস্থায়ী, এর মোহে আকৃষ্ট হয়ো না। এই ক্ষণস্থায়ী জীবন পরকালের জন্য প্রস্তুতির শষ্যক্ষেত্র-স্বরূপ। একে মিথ্যা বিশ্বাস ও ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার পিছনে পড়ে থেকে নষ্ট করো না। এটি বড় কাজের জিনিস, এটিকে হারিয়ে বসো না।

এই পথিকালয় সাময়িক, এর প্রেমে মত্ত হয়ো না। এই ভোগ-বিলাস পূর্ণ জীবন চিরস্থায়ী নয় এর মোহে আচ্ছন্ন হয়ো না।

ফার্সি নযম

১. এই নীচ পৃথিবীর বিলাসিতা ক্ষণভঙ্গুর, অবশেষে বোঝাপড়ার জন্য খোদার কাছে যেতেই হবে।

২. এই পৃথিবী ক্ষয়, মৃত্যু ও অবলুপ্তির আবাসস্থল; যে এখানে আসন গ্রহণ করবে তাকে একদিন আসন ছাড়তে হবে।

৩. ক্ষণিকের জন্য কবরস্থানে যাও; আর সেখানকার চিরনীরব লোকদের জিজ্ঞেস কর যে অবস্থা কেমন?

৪. পার্থিব জীবনের চূড়ান্ত পরিণতি কী? যে জন্ম নিয়েছে সে কতদিন জীবিত ছিল?

৫. বিদ্বেষ, অহংকার এবং গর্ব ও আত্মম্ভরিতা পরিহার কর,

কোথাও এই আচরণ তোমাকে ভ্রষ্টতার দিকে না টেনে নিয়ে না যায়।

৬.যখন তুমি এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে,তখন এই সকল শহর ও দেশে আর ফিরবে না।

৭. হে ধর্ম সম্পর্কে উদাসিন, ধর্মের জন্য ব্যথিত হও কেননা তোমার মুক্তি পুরোটাই ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৮. শোন, নিজের এই দুঃখের বিষয়ে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করবে না। কেননা তোমার সামনে এক কঠিন কাজ রয়েছে।

৯. তোমার হৃদয়কে এই দুঃখ ও বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত হতে দাও ; কেবল হৃদয় নয় প্রাণকেও উৎসর্গ করে দাও।

১০. তোমার সকল কাজ সেই এক সত্তার সাথে সম্পর্কযুক্ত; পরিতাপ! তাঁকে বাদ দিয়ে তোমার জন্য ধৈর্য্য ধারণ কি করে সম্ভব হতে পারে?

১১. তুমি যখন মুখ ফিরিয়ে নাও তোমার ভাগ্যও বদলে যায় আর বিনয় প্রদর্শন করলে সম্পদ লাভ হবে।

১২. তুমি কেন এমন বন্ধুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করছ? কেন এমন নির্বোধদের মত আচরণ করছ?

১৩. এই পৃথিবী লাশতুল্য; লোভীরা একে কুকুরের ন্যায় পরিবেষ্টন করে রেখেছে।

১৪. সৌভাগ্যবান সে মানুষ যে সেই লাশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং লালন-পালন কর্তার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

১৫. আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবার প্রতি চোখ বন্ধ করে সে সুবিচার করে আর বন্ধুর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়।

১৬. লোভ, লিপ্সা ও কামনা-বাসনার এই তুফান ততক্ষণ বিরাজমান থাকে যতক্ষণ মানুষ অন্ধ থাকে।

১৭. হৃদয়-চক্ষু যদি একটুও খুলে যায় মানুষের সকল কামনা-বাসনা লোপ পায়।

১৮. হে সে ব্যক্তি যে লোভ-লিপ্সাকে লাগামহীন ছেড়ে দিয়েছে, কেন নিজের কামনা বাসনা হতে বিরত হও না?

১৯. জীবনরূপী নিয়ামত প্রতিটি মুহূর্ত ক্ষয়ীষ্ণু অথচ তুমি কেবল ধনসম্পদ নিয়েই চিন্তিত!

২০. আত্মীয়-স্বজন, স্বজাতি ও গোত্র; এসবই অনেক বড় প্রহসন। অথচ তুমি তাদের জন্য খোদার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে রেখেছ?

২১. এদের সকলেরই সংকল্প হলো তোমায় বধ করা; কখনও শান্তিপূর্ণভাবে

কখনও বা যুদ্ধের মাধ্যমে।

২২. সে সকল সম্পর্ক অভিশপ্ত যা আন্তরিক বন্ধুর সাথে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন করে।

২৩. অবশেষ সেই খোদার সাথেই তোমার কাজ পড়বে; কেউ তোমার সাহায্যকারী নয় আর তুমিও কাউকে সাহায্য করতে পার না।

২৪. ভয় ও পূর্ণ সাবধানতার সাথে কদম ওঠাও যেন তুমি সফলভাবে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পার।

২৫. যেন খোদা তোমাকে নিজের বন্ধু হিসেবে অবলম্বন করতে পারেন আর তোমার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি প্রদান করেন।

২৬. আর যেন তুমি প্রেম-সূধা পান কর আর সে সূধার নেশায় আচ্ছন্ন হও অচেতন পড়ে থাক।

২৭. এই পৃথিবী চিরকাল থাকার জায়গা নয়; বিবেক খাটাও তোমার পরিণতি যেন অশুভ না হয়।

২৮. সেই জীবিত খোদার ভালবাসা তোমার জ্যোতিকে প্রখর করবে; এসকল মৃতদের ভালবাসা তোমার কি কাজে আসতে পারে?

২৯. খাবার, পেট, মাথা ও মুকুট বা পাগড়ি সবকিছু খোদার দান।

৩০.পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বে স্রষ্টার অধিকার সম্পর্কে কিছুটা সচেতন হও, লজ্জাবোধকে কাজে লাগাও।

৩১. কেন তুমি তাঁর প্রতি অবজ্ঞা দেখাও? কুকুরও বিশ্বস্ততা প্রদর্শন করে কিন্তু তুমি যে মানুষ!

৩২. সবচেয়ে শক্তিশালী সত্তাকে ভয় করা উচিত, যে খোদাকে যত বেশী চিনে সে তত বেশী ভয় করে।

৩৩. পাপাচারীরা নোংরা কাজে লিপ্ত আর তত্ত্বজ্ঞানীরা দোয়া ও আহাজারীতে রত।

৩৪. বড়ই সৌভাগ্যবান সে চোখ, যে তাঁর জন্য অশ্রুবিসর্জন দেয়, তাঁর প্রেমানলে দহনশীল হৃদয় বড়ই কল্যাণমন্ডিত।

৩৫. বড়ই কল্যাণমন্ডিত সে, যে তাঁর সন্ধানী, আর বন্ধুর খাতিরে যদু-মধু সকলকে পরিত্যাগ করে।

৩৬. যে কেউ এক-অদ্বিতীয় খোদার পথকে আঁকড়ে ধরবে উভয় জগতে সেই খোদা তার জন্য যথেষ্ট।

৩৭.এতে সন্দেহ নেই, যে খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানী সে খোদার জন্য সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

৩৮. তার ধর্ম হলো বন্ধুর জন্য আত্মনিবেদন করা আর খোদার জন্য আপন প্রাণ বিসর্জন দেয়া।

৩৯. (তার রীতি হলো) খোদার সন্তুষ্টির জন্য মাটি হয়ে যাওয়া, আত্মবিলুপ্তি, নিজের অস্তিত্ব মিটিয়ে দেয়া এবং নিজেকে নিঃশেষ করার বাসনা লালন করা।

৪০. বন্ধুর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকা আর তকদীরের প্রকাশিত সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট থাকা।

৪১. তুমি খোদার সাথে অন্যদেরও ভালবাস, কিন্তু এ ধারণাই ভ্রষ্টতার মূল।

৪২. যদি তোমাকে বিবেক ও পৌরুষ দেয়া হতো, তাহলে পুরো সৃষ্টিকে ছেড়ে দিয়ে কেবল খোদার প্রতি মনোযোগী হতে।

৪৩. যেহেতু হৃদয় একটি, প্রাণও একটি, দেহও একটি, তাই প্রকৃত পক্ষে প্রেমাস্পদও একজনই যথেষ্ট ।

৪৪. প্রত্যেক ব্যক্তি যে একমাত্র সত্তারই প্রেমে মত্ত হয় ,তার জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়া সহজ বিষয়।

৪৫. তার গলি তার কাছে বাগানের চেয়ে শ্রেয় আর তার চেহারা রাইহান (ফুল) থেকে অধিক আকর্ষণীয়।

৪৬. প্রেমাস্পদ তার সাথে যে ব্যবহারই করে তা তার জন্য উত্তম হয়ে থাকে; বন্ধুকে দেখা তার জন্য শতবার জীবন পাওয়া হতে শ্রেয় হয়ে থাকে।

৪৭. বিরহে বাগানে ভ্রমণ করা থেকে বন্ধুর সামনে শিকলাবদ্ধ হওয়া তার কাছে প্রিয়তর।

৪৮. যার কোন প্রেমাস্পদ থাকে তার সাথে সাক্ষাত ছাড়া সে কোনভাবে স্বস্তি পায় না।

৪৮. বন্ধু-বিরহে সে রজনী অতিবাহিত করে বিছানায় ছটফট করে; সারা পৃথিবী নিদ্রাচ্ছন্ন আর সে কাটায় সারা রাত বিনিদ্র অবস্থায়।

৪৯. যতক্ষণ তার দর্শণ লাভ না হয় সে স্বস্তি পায় না, প্রতিটি মুহূর্ত প্রেমের করাল প্লাবন তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে থাকে।

৫০. প্রেমিকদের হৃদয় কিভাবে স্বস্তি পেতে পারে? বন্ধুকে দেখা থেকে মানুষ কি করে তৌবা করতে পারে?

(চলবে)

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

দৃষ্টি আকর্ষণ

আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আ.)-এর রচিত পুস্তক 'বারাহীনে আহমদীয়া' আহমদী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বাংলায় নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, আলহামদুলিল্লাহ। পাঠকদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, এই অনুবাদের ক্ষেত্রে যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় বা আরো উত্তম কোন শব্দ ব্যবহার করলে ভালো হবে বলে মনে করেন, সে ক্ষেত্রে আমাদের কাছে লিখে পাঠাতে পারেন এই ঠিকানায়-

পাক্ষিক আহমদী
৪, বকশী বাজার, রোড ঢাকা, ১২১১
মোবাইল: ০১৭১৬-২৫৩২১৬
masumon83@yahoo.com

জুমুআর খুতবা

মহানবী (সা.)-এর শরীয়তকে পৃথিবীতে প্রচার করাই হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর দায়িত্ব

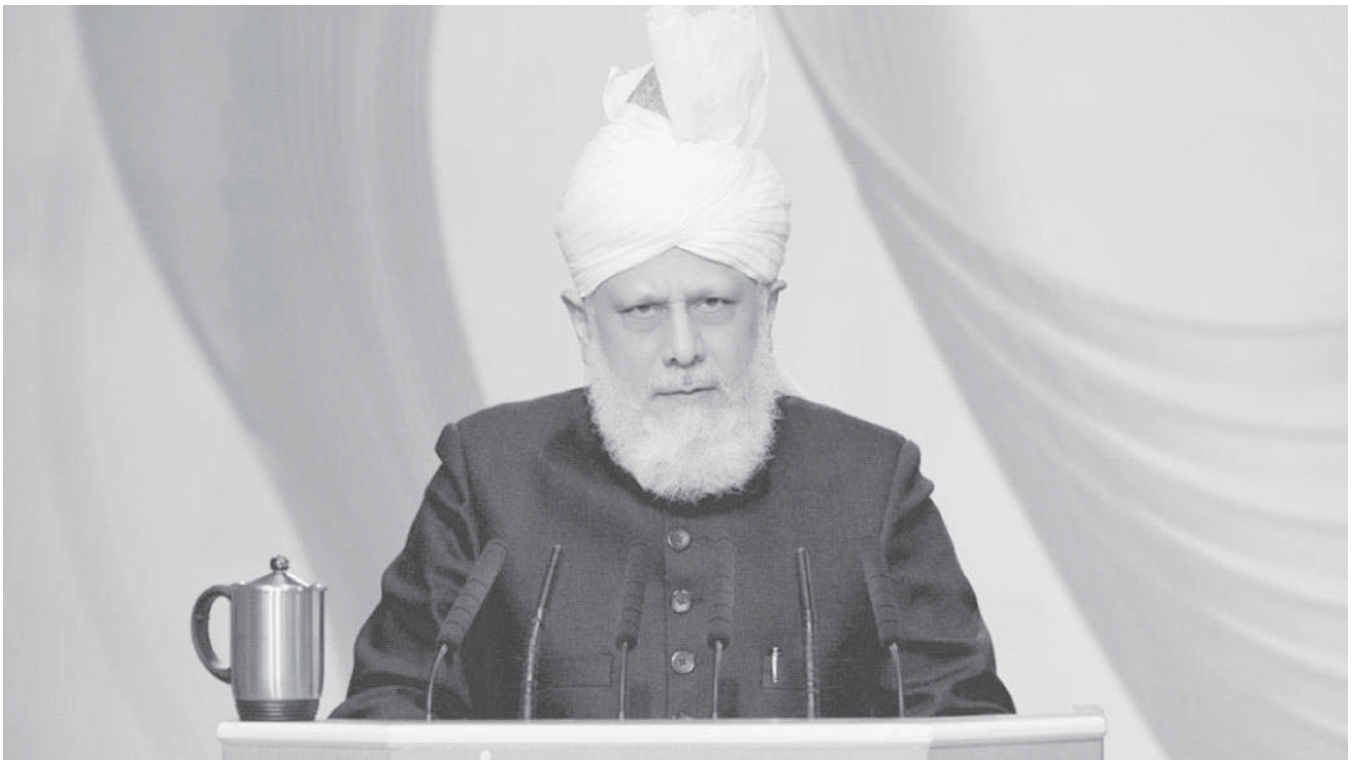

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবি এবং জামাতের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এবং তাঁর মান্যকারীদের ওপর মুসলমানদের পক্ষ থেকে সবসময় এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নবী হবার দাবি করে বা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নবী হিসেবে মেনে আমরা যেন খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করেছি। অথচ আমরা জানি যে, এটি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা আর আমাদের বিরুদ্ধে একটি অপবাদ। আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষা অনুসারেই মুহাম্মদ (সা.)-এর খতমে নবুওয়তে তাদের চেয়ে বেশি বিশ্বাসী এবং একে কাজে রূপায়নকারী আর আমাদের হৃদয়কে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেমে পরিপূর্ণকারী এবং তাঁর ধর্মকে পৃথিবীতে প্রচারকারী, যতটা না মুসলমানদের অন্যান্য ফিরকা তা প্রকাশ করে বা মানে। বরং সত্যিকার অর্থে অন্যান্য মুসলমানরা মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদাকে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও বোঝে নি যতটা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর শিক্ষার কারণে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীরা তা অনুধাবন করে।

যাহোক, খতমে নবুওয়তকে ভিত্তি করে

আহমদী ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতীদের জন্য আবশ্যক হবে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরী জ্ঞান অর্জন করা। সে শিক্ষা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যা এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে অবহিত করেছেন আর যার ওপর আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার শেষ শরীয়তধারী নবী, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সত্তায় নবুওয়তের সমাপ্তি ঘটেছে অর্থাৎ এখন আর নতুন কোন শরীয়ত নাযিল হতে পারে না আর পবিত্র কুরআন সর্বশেষ শরীয়ত গ্রন্থ।

অন্যান্য মুসলমানরা সবসময় আহমদীদের বিরোধিতা করে আসছে আর বিভিন্ন সময়কোন না কোন অজুহাতে এক্ষেত্রে উত্তেজনা অনেক বেড়ে যায় বা নামধারী বিভিন্ন আলেম এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এই প্রেক্ষাপটে মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করা হয়।

সম্প্রতি গ্লাসগো'তে যে আহমদীর শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছে এর ভিত্তিতে বিরোধিরা আত্মরক্ষার জন্য একে ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির নামে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সরকারের ইতিবাচক মনোভাব এবং প্রচার মাধ্যমের সীমাহীন আগ্রহের কল্যাণে এরা বাহ্যতঃ কিছুটা ক্ষমা প্রার্থনা-সূলভ মনোভাব প্রকাশ করেছে। মুসলমানদের অনেক সংগঠন বরং মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সংগঠনের এই মনোবৃত্তিই ছিল। কিন্তু একই সাথে তারা এই হঠকারিতারও বহিঃপ্রকাশ করে যে, আহমদীরা অবশ্যই মুসলমান নয়। তাদের মসজিদগুলোতে একথা প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা সীমা ছাড়িয়ে যায়। আর জনসাধারণের হৃদয়ে এই বিষয়ে এরা এতটাই বিষোদগার করেছে যে, মুসলমানদের সন্তান-সন্ততিযাদের হয়তো কলেমাও ভালোভাবে জানা নেই, যারা হয়তো জানেই না যে, খতমে নবুওয়ত কাকে বলে, তারা স্কুলে আহমদী ছেলে-মেয়েদের বলে যে, তোমরা মুসলমান নও।

কোন কোন ছেলে-মেয়ে সম্প্রতি আমাকে লিখেছে, আমাদের সাথে স্কুলে এরূপ ব্যবহার করা হয়। আমি তাদের এটিই বলি যে, পূর্বের চেয়ে বেশি ইসলামের কথা শিখুন, বন্ধুদেরকে বা সাথীদের বলুন যে, আমরা মুসলমান আর ইসলামী শিক্ষা মেনে চলি। রসূলে করীম(সা.)-কে আমরা খাতামান নবীঈন মানি। আর তিনি (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই আগমনকারী মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর দাস এবং অধিনস্ত নবী মানি।

যাহোক, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীদের বিরুদ্ধে কিছুদিন পরপরই এই উত্তেজনা মাথা চাড়া দেয় আর এখন যেহেতু প্রচার মাধ্যম এবং যাতায়াতের সুযোগ সুবিধার কারণে বিরোধী এবং বিরোধিতা সর্বত্র পৌঁছে যায়। তাই পৃথিবীর কোন দেশই এখন নৈরাজ্যবাদী ও নামধারী মুসলমানদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। এখন এরা আফ্রিকায়ও পৌঁছে যায় যেখানে এরা পূর্বে কখনো যায় নি, আর যে অঞ্চলের মানুষ ছিল বিধর্মী বা খ্রিষ্টান বা মুসলমান থাকলেও নামে মাত্র সেখানে গিয়ে আহমদীরা যখন জামাত প্রতিষ্ঠা করে ও মসজিদ নির্মাণ করেতখন এমন স্থানেও এরা পৌঁছে যায় আর গিয়ে বলে, আহমদীরা মুসলমান নয়।

যাহোক, এই হলো তাদের আক্রমন আর এই হলো তাদের অস্ত্র যা তারা ব্যবহার করে। আর একই কারণে ইউরোপেও তারা পৌঁছে আর মসজিদ, মাদ্রাসা বা ঘরে তারা যে শিক্ষা দেয় এসব কারণে তাদের সন্তান-সন্ততির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং তাদের মন-মস্তিষ্ককে বিষিয়ে তুলছে কিন্তু যেসব স্থানে তারা পৌঁছে সেখানে আমাদের সব আহমদী ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতীদের জন্য আবশ্যক হবে, ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরী জ্ঞান অর্জন করা। সে শিক্ষা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যা এ যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে অবহিত করেছেন আর যার ওপর আহমদীয়া জামা'ত প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার শেষ শরীয়তধারী নবী, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সত্তায় নবুওয়তের সমাপ্তি ঘটেছে অর্থাৎ এখন আর নতুন কোন শরীয়ত নাযিল হতে পারে না আর পবিত্র কুরআন সর্বশেষ শরীয়ত গ্রন্থ।

অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসত্বে ও আনুগত্যে এসেছেন এবং তিনি তাঁর দাস ও অনুগত নবী এবং তাঁর শরীয়তকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী নবী। মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়তকেই পৃথিবীতে প্রচার করা হলো তাঁর দায়িত্ব।

যাহোক, জামাতের সাথে আমরা সব সময় আল্লাহ্ তা'লার এই ব্যবহার দেখেছি যে, যখনই বিরোধিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এসব বিরোধিতা জামাতের উন্নতির ক্ষেত্রে সার

হিসেবে কাজ করেছে। এটি নিয়ে আমরা কখনো চিন্তিত ছিলাম না, চিন্তিত নই এবং চিন্তা হওয়া উচিতও নয়। বর্তমান বিরোধিতার ফলেও প্রচার মাধ্যমের সুবাদে জামাত ব্যাপকভাবে পরিচিত হয়েছে যা হয়তো এত স্বল্প সময়ে আমাদের জন্য করা সম্ভব ছিল না। এর কল্যাণে এখানে বা এই দেশেও এদিকে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া অনেক আহমদী যুবক যারা ধর্মের প্রতি খুব একটা আগ্রহ রাখতো না, যাদের অনেকেরই জামাতের সাথে খুব একটা উঠাবসা ছিল না বা আসা যাওয়া হতো না, কেবল ঈদের সময় আসতো বা সম্পর্ক থাকলেও অনেক হালকা ছিল, এখন প্রচার মাধ্যমের সুবাদে তারাও জানতে পেরেছে যে, আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নবী মানি, কিন্তু তা মহানবী (সা.)-এর দাসত্বে এবং আনুগত্যে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের দায়িত্ব কীভাবে পালন করেছেন আর খাতামান নবীঈন হিসেবে তিনি (সা.)-এর মর্যাদা কীভাবে প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন, কীভাবে আমাদের পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন এ সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিছু উক্তি আমি উপস্থাপন করবো। তিনি (আ.) বলেন, "নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো! কোন ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না আর মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী বলে গণ্য হতে পারে না যতক্ষণ সে মুহাম্মদ (সা.)-কে খাতামান নবীঈন বলে বিশ্বাস না করবে, এবং যতক্ষণ (মনগড়া) এসব নিত্য নতুন কথার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করবে অর্থাৎ এই যে, নতুন নতুন কথা, বিভিন্ন যিকির-আযকার, বিভিন্ন প্রকার বিদাত এবং নতুন কথার উদ্ভাবন যা মানুষ করেছে এগুলো থেকে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে,ততক্ষণ মুসলমান আখ্যায়িত হতে পারে না। এগুলোর সূচনা মসীহ্ মাওউদ (আ.) করেন নি বরং বিভিন্ন আলেম ও মাশায়েখ এসবের সূচনা করেছে। তিনি (আ.) বলেন, যতক্ষণ এগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করবে আর কথা এবং কর্মে তিনি (সা.)-কে খাতামান নবীঈন না মানবে ততক্ষণ সে কিছুই নয়।

এগুলো কেবল মৌখিক দাবি নয় বরং কার্যতঃ মহানবী (সা.)-কে খাতামান নবীঈন মানা আবশ্যক, যদি না মানে তাহলে তিনি (আ.) বলেছেন, এমন ব্যক্তি অর্থহীন। তিনি (আ.) বলেন, সাদী কতই না সুন্দর লিখেছেন,

অর্থাৎ, **"তাক্বওয়া এবং খোদাভীতি আর নিষ্ঠা ও সততার চেষ্টা অবশ্যই কর, কিন্তু মুস্তফা (সা.)-এর শিখানো রীতিকে লঙ্ঘন করে নয়।"**

তিনি(আ.) বলেন, "আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যার বাস্তবায়নের জন্য খোদা তা'লা আমাদের হৃদয়ে আবেগ এবং প্রেরণা সঞ্চার করেছেন তাহলো শুধু হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুওয়ত প্রতিষ্ঠা করা যা আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আর সকলমিথ্যা নবুওয়তকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা যা এরা নিজেদের বিদআত বা নিত্য নতুন কথা উদ্ভাবনের মাধ্যমে সূচিতকরেছে। নিত্য নতুন কথা উদ্ভাবন করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুওয়ত থেকে এরা বিচ্যুত। সত্যিকার অর্থে এরাই খতমে নবুওয়তের মোহর লঙ্ঘনকারী। এসব পীরদের গদী দেখ আর কার্যতঃলক্ষ্য কর যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুওয়তে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি নাকি এরা? খতমে নবুওয়তের পেছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কেবল এটিই হবে এমনটি মনে করা অন্যায় এবং অবিচার যে, কেবল মুখে খাতামান নবীঈন মান আর কাজ তাই কর যা নিজেদের পছন্দমতো হয় আর নিজেদের এক পৃথক শরীয়ত আবিষ্কার কর। বাগদাদী নামায, মাকূস নামায ইত্যাদি কোন কোন মুসলমান দল আবিষ্কার করে রেখেছে। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফ এবং রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শে এর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কি?

অনুরূপভাবে 'ইয়া শেখ আব্দুল কাদের জিলানী শায়উল্লিল্লাহ্' বলার প্রমাণ কুরআনের কোন স্থানে আছে কি? রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে শেখ আব্দুল কাদের জিলানীর অস্তিত্বই ছিল না। প্রশ্ন হলো কে এটি শিখিয়েছে? কিছুটা লজ্জিত হও, ইসলামী শরীয়ত অনুসরণ এবং শরীয়ত মেনে চলা কি একেই বলে?

নিজেরাই সিদ্ধান্ত কর যে, এরূপ বিশ্বাস পোষণের পর কোন মুখে আমার ওপর এই অপবাদ আরোপ করছো যে, আমি খাতামান নবীঈনের মোহর লঙ্ঘন করেছিবা ভঙ্গ করেছি। আসল কথা এবং সত্য কথা হলো, যদি তোমরা তোমাদের মসজিদে বিদআতকে প্রবেশের অনুমতি না দিতে আর মুহাম্মদ (সা.) খাতামান নবীঈন (সা.)-এর সত্যিকার নবুওয়তে ঈমান এনে তাঁর কর্মপন্থা এবং পদাঙ্ককে পথ-প্রদর্শক হিসেবে শিরোধার্য করতে তাহলে আমার আসার প্রয়োজনই বা কী ছিল? তোমাদের এসব বিদআত এবং নিত্য নতুন নবুওয়তই খোদা তা'লার আত্মাভিমানে আঘাত হেনেছে যেন আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর চাদরে সজ্জিত করে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে পারেন যিনি মিথ্যা নবুওয়তের প্রতিমাকে খণ্ড বিখণ্ড করে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন। অতএব এসব কাজের জন্যই খোদা তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন।"

তিনি(আ.) বলেন, "গদিনশিনদের সিজদা করা বা তাদের বাড়ি-ঘরের তাওয়াফ করাসামান্য ব্যাপার। বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'তকে সৃষ্টি করেছেন মহানবী (সা.)-এর নবুওয়ত এবং সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। এক ব্যক্তি, যে কারো প্রেমিক আখ্যায়িত হয়, তার মত যদি আরো সহস্র সহস্র প্রেমাস্পদ থাকে তাহলে তার প্রেম ও ভালোবাসার বিশেষত্ব বা স্বতন্ত্রতাই বা কী থাকলো? অর্থাৎ একজনের প্রতিকারো ভালোবাসা থাকে, তার মতই যদি আরো সহস্র সহস্র মানুষ সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে যাকে ভালবাসা হয় তার বিশেষত্বই বা কী থাকলো? এদের দাবি অনুসারে এরা রসূলপ্রেমে বিভোর,প্রশ্ন হলো ব্যাপার কী, তারা সহস্র সহস্র মাজার এবং খানকারও পূজা করে? নিঃসন্দেহে এরা মদীনা শরীফ যায় কিন্তু আজমীর এবং অন্যান্য খানকাবা দরবারেও খালি মাথা এবং খালি পায়ে যায়,মুক্তির জন্য পাক পতনের জানালা অতিক্রম করাই যথেষ্ট মনে করে (অর্থাৎ পাক-ভারতের বিভিন্ন জায়গা যেখানে এসব বুযূর্গদের জন্ম হয়েছে সেখানেতারা যায় এবং এরা তাদের কবর পূজা করে)।

এরা মনে করে, পাক পতনের জানালা অতিক্রম করাই মুক্তির জন্য যথেষ্ট অন্য কোন নেক সৎকর্মের প্রয়োজন নেই, কেবল এমনটি করলেই মুক্তি পেয়ে যাবে। কেউ কোন পতাকা উড্ডীন করে রেখেছে। কেউ এক রূপ ধারণ করেছে আর কেউ ভিন্ন আকৃতি। এদের ওরশ এবং মেলা দেখে একজন সত্যিকার মুসলমানের হৃদয় কেঁপে উঠে যে, এরা এসব কি আরম্ভ করেছে?

যদি ইসলামের জন্য খোদার আত্মাভিমান কাজ না করতো আর

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

(সূরা আলে ইমরান: ২০) যদি খোদার উক্তি না হতো আর তিনি যদি না বলতেন যে,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

(সূরা আল্ হিজর: ১০) তাহলে আজকে নিঃসন্দেহে ইসলাম এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল যেখানে এর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় কোন সন্দেহই আর বাকি থাকতো না। কিন্তু খোদার আত্মাভিমান কাজ করেছে, তাঁর করুণা এবং তাঁর হিফাযত করার প্রতিশ্রুতির দাবি ছিল হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বুরূয বা প্রতিচ্ছবিকে নাযিল করাএবং এযুগে তাঁর নবুওয়তকে নতুনভাবে জীবিত করে দেখানো। তাই তিনি এই জামাত প্রতিষ্ঠা করেন আর আমাকে প্রত্যাদিষ্ট এবং মাহদী হিসেবে পাঠিয়েছেন।"

এরপর মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে একবার তিনি (আ.) বলেন, **"আমাদের আসল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হলো,মহানবী (সা.)-এর প্রতাপ প্রকাশ করাএবং তাঁর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের নাম কথা প্রসঙ্গে এসেছে মাত্র কেননা; মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাঝে আকর্ষণ এবং কল্যাণ সাধনের বৈশিষ্ট্য আছে আর এই কল্যাণ সাধনের প্রেক্ষাপটে আমাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।"** অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভেতর কল্যাণ সাধন এবং হিত সাধনের বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি (আ.) বলেন, **"এ প্রেক্ষাপটেই আমার উল্লেখ এসেছে মাত্র। মহানবী (সা.)-এর কল্যাণ সাধনের বৈশিষ্ট্যই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মর্যাদা দিয়েছে।"** অতএব রসূলে করীম (সা.)-এর কল্যাণের গন্ডিই হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে নিজের মাঝে বেষ্টিতকরেছে আর এখন মহানবী (সা.)-এর উল্লেখের পাশাপাশি তাঁর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিকেরও উল্লেখ হলো।

এরপর তাঁর প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "হাজার বছরের অন্ধকার যুগের ফলে মুসলমানদের মাঝে যে নতুন নতুন বিশ্বাস এবং বিদআতের সূচনা হয়েছে তার সংশোধনই হলো উদ্দেশ্য।"একথা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "আমি পুনরায় বলছি, আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যারা আসেন তারা কোন নিরর্থক কথা বলেন না।তারা শুধু এ কথাই বলেন যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর আর সৃষ্টির প্রতি সদ্ব্যবহার কর, নামায পড়, আর ধর্মে যেসব ভুল-ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলো ছেড়ে দাও। আমি এখন প্রেরিত হয়েছি সেসব ভুল-ভ্রান্তির সংশোধনের জন্য যা বক্র যুগে দেখা দিয়েছে। মুসলমানদের মাঝে যে বক্র যুগ বা অন্ধকার যুগ এসেছে সেই যুগে এসব সৃষ্টি হয়েছে।

আর সবচেয়ে বড় ভ্রান্তি হলো, আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য এবং প্রতাপকে ধূলিস্মাৎ করা হয়েছে। আর মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত, গুরুত্বপূর্ণ আর সুমহান একত্ববাদের শিক্ষাকে সন্দেহযুক্ত করা হয়েছে। একদিকে খ্রিষ্টানরা বলে, ঈসা (আ.) জীবিত আর আমাদের নবী (সা.) জীবিত নন আর এর ভিত্তিতে তারা ঈসা (আ.)-কে খোদা এবং খোদার পুত্র আখ্যায়িত করে কেননা; তিনি দু'হাজার বছর ধরে আকাশে জীবিত আছেন। কালের কোন প্রভাব তার ওপর পড়ে নি। অপরদিকে মুসলমানরাও একথা মেনে নিয়েছে যে, ঈসা (আ.) নিঃসন্দেহে জীবিত আকাশে গিয়েছেন এবং দু'হাজার বছর ধরে সেভাবেই জীবিত আছেন। তার অবস্থা আর আকৃতি এবং প্রকৃতির মাঝে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় নি আর মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। আমি সত্য সত্যই বলছি, আমার হৃদয় কেঁপে উঠে যখন আমি একজন মুসলমান মৌলভীর মুখে একথা শুনি যে, মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন বা মারা গেছেন। জীবিত নবীকে মৃত রসূল আখ্যা দেয়া হয়েছে। এর চেয়ে বড় অসম্মান এবং অবমাননা ইসলামের আর কি হবে?

কিন্তু এটি স্বয়ং মুসলমানদেরই ভ্রান্তি যারা পবিত্র কুরআনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এক নতুন কথা সৃষ্টি করেছে। পবিত্র কুরআনে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এই ভুল নিরসনের দায়িত্ব আমার জন্যই নির্ধারিত ছিল কেননা; আমার নাম আল্লাহ্ তা'লা 'হাকাম' রেখেছেন। যিনি সিদ্ধান্তের জন্য আসবেনতিনি এই ভ্রান্তি দূরীভূত করবেন। পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি কিন্তু খোদা তা'লা তাকে গ্রহণ করবেন এবং জোরালো আক্রমণ সমূহের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন। এমন কথাবার্তা পৃথিবীর ভয়াবহ ক্ষতি করেছে।" তিনি (আ.) বলেন, "এখন এসব মিথ্যা প্রকাশিত হওয়ার সময় এসে গেছে।

আল্লাহ্‌তা'লা যাকে 'হাকাম'ন্যায় বিচারক হিসেবে পাঠিয়েছেন তার সামনে এসব কথা গোপন থাকতে পারে না। দাই এর সামনে পেট গোপন থাকতে পারে না। কুরআন পরিষ্কার সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, শেষ খলীফা মসীহ্ মাওউদ হবেন আর তিনি এসে গেছেন। এখনো যদি কেউ বক্রযুগের গতানুগতিক ধ্যান-ধারনার অন্ধ অনুকরণ করে তাহলে সে শুধু নিজেরই ক্ষতি করবে না বরং ইসলামের জন্যও ক্ষতিকারক সাব্যস্ত হবে। আর সত্যিকার অর্থে এই ভ্রান্ত এবং অপবিত্র বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে মুরতাদ করেছে।

এই নীতি ইসলামেরচরম অসম্মান এবং অবমাননা করেছে আরমুহাম্মদ (সা.)-এরও অসম্মান করেছেযখন তারা এই বিশ্বাস করে বসলো যে, ঈসা (আ.)ই মৃতদের জীবনদানকারী, আকাশে আরোহনকারী এবং শেষ ন্যায় বিচারক, তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, সেখানে আমাদের নবী করীম (সা.) তো নাঊযুবিল্লাহ্ কিছুই প্রমাণিত হলেন না অথচ তাকে 'রহমাতুল্লিল আলামীন' বলা হয়েছে। আর তিনি 'কাফফাতাল লিন্নাস' অর্থাৎ সমগ্র মানবতার জন্য রসূল হিসেবে

এসেছেন। তিনিই হলেন খাতামান্নাবিঈন। যারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়েও এমন ভ্রান্ত ও বাজে বিশ্বাস পোষণ করে তাদের আরেকটি বিশ্বাস হলো, এখন যত পাখি রয়েছে তাদের কিছু ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি আর কিছু আল্লাহ্ তা'লার, নাঊযুবিল্লাহ্ মিন যালেক। আমি একবার এক একত্ববাদী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছিলাম, এখন যদি দু'টো প্রাণীকে পেশ করা হয় আর জিজ্ঞেস করা হয়, কোনটি আল্লাহ্‌র আর কোনটি ঈসা (আ.)-এর ? তখন সে উত্তরে বলে, এগুলো এখন কনফিউজিং বা সন্দেহপূর্ণ, এটি এখন ঘোলাটে হয়ে গেছে বা গুলিয়ে গেছে, স্পষ্ট করে বলা কঠিন যে, কোনটি কার।

এখন আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কিছু উক্তি এবং কিছু ঘটনা উপস্থাপন করবো যাতে তার পবিত্র জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক ফুটে উঠে আর তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তার মনিব এবং অনুসরণীয় নেতা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদা এবং মাকামকে শুধু জ্ঞানগত বা যৌক্তিক দিক থেকেই প্রমাণ করেই ক্ষ্যান্ত দেননি বরং তাঁর শিক্ষা এবং কর্মের মাধ্যমে ইসলামিক শিক্ষারও ব্যবহারিক প্রতিফলনঘটে।

একবার আব্দুল হক নামী এক যুবক যে কলেজের ছাত্র ছিল এবং পূর্বে মুসলমান ছিল আর পরে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়; যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, অনেকেই ইসলাম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়, এ ব্যক্তিওতাদেরই একজন ছিল। সত্য সন্ধানে বা এমনিতেই উৎসুক্য-বশতঃ বা গবেষণার জন্য সে কাদিয়ান আসে আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে কিছুদিন অবস্থান করে। বিভিন্ন মুলাকাতে তিনি (আ.) তার সামনে বিভিন্ন মসলা-মসায়েল বর্ণনা করতেন। একবার সে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সম্বোধন করে বলে, একজন খ্রিষ্টানের সামনে আপনার নাম নেয়াহলে সে আপনাকে গালি দেয়। সেই যুবক বলে, আমার কাছে এটি খুবই খারাপ লাগে। একথা শুনে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে উত্তর দিয়েছেনতা মূলতঃ তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্রেরও বহিঃপ্রকাশ।

তিনি (আ.) বলেন, "গালি যে দেয় আমি আমি এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না, গালিতে পরিপূর্ণ অনেক চিঠি-পত্র আসে যার মাশুল দিয়ে আমাকে সেই চিঠি নিতে হয় আর খুললে তা গালি-গালাজে পরিপূর্ণ দেখি, এছাড়া বিজ্ঞাপনেও গালি দেয়া হয়। আজকালও একই অবস্থা, পাকিস্তানে (গালমন্দ সম্বলিত) বড় বড় বিজ্ঞাপন লাগানো হয়। আর এখন তো খোলা খামে গালি লিখে পাঠানো হয়ে হয়, তাই এসব কথায় কি-ইবাযায় আসে। আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতি কোনভাবে নির্বাপিত হতে পারে কি? সব সময় নবী এবং পুণ্যবানদের সাথে অকৃতজ্ঞরা এই ব্যবহারই করেছে। অর্থাৎ ঈসা (আ.), যার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমরা এসেছি, তাঁর সাথে কী ব্যবহার করা হয়েছে? এই ব্যক্তি যেহেতু খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল তাই তার সামনে তিনি (আ.) ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, তাকেও গালি দেয়া হয়েছে, অত্যাচার করা হয়েছে আরক্রুশবিদ্ধও করা হয়েছে।"পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, আমাদের নবী করীম (সা.)-এর সাথে হেন দুর্ব্যবহার নেই যা করা হয়নি। আজ পর্যন্ত নোংরা প্রকৃতির মানুষ তাঁকে গালি দেয়, আমি মানব জাতির সত্যিকার শুভাকাঙ্ক্ষী, যে আমাকে শত্রু মনে করে সে নিজ প্রাণেরই শত্রু।

যেমনটি আমি বলেছি, আব্দুল হক নামের এই ব্যক্তির সাথে বেশ কয়েকদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আলোচনা চলতে থাকে, আর তিনি (আ.) তার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। একদিন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে বলেন, আমি আপনাকে বারংবার একথাই বলব যে, যতদিন কোন কথা আপনি পুরোপুরি না বুঝবেন ততদিন তা বার বার জিজ্ঞেস করুন। এমনটি ভাল নয় যে, একটি কথাতো বুঝলেন না অথচনা বুঝেই বলে বসবেন যে, হ্যাঁ, আমি বুঝে গেছি, এর ফলাফল ক্ষতিকর হয়ে থাকে। এটি তাঁর বড় মনের পরিচায়ক, তিনি (আ.) বলেন, বারবার জিজ্ঞেস করবে। তাঁর মাঝে এক উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা ছিল যে, মানুষের সামনে সত্য স্পষ্ট হবে আর তারা তা গ্রহণ করবে। এই যুবক সিরাজ উদ্দীন খ্রিষ্টানকেও জানত, যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রশ্ন করেছিল, মসীহ্ মাওউদ (আ.) তার উত্তরও দিয়েছেন, যা পরে পুস্তিকাকারেও ছাপাহয়েছে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন,

সিরাজ উদ্দীন, যে এখানে এসেছে, সে এমনই করেছে, সে প্রশ্ন করত আর নিরব থাকত আর উত্তরের পর প্রশ্ন করত না। এখানে এসেও তার কোন লাভ হয় নি। প্রতিটি কথায় সে ইতিবাচক সায় দিত আর পূতঃপবিত্র মন-মানসিকতা নিয়ে তার হৃদয়ে যে সন্দেহ ছিল বা যেই সন্দেহ দানা বেধে ছিল তা দূরীভূত করার চেষ্টা করেনি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে আর অতিরিক্ত প্রশ্নও জিজ্ঞেস করেনি। যা লিখে নিয়ে এসেছে তাই জিজ্ঞেস করেছে। বা মসীহ্ মাওউদ (আ.) যা উত্তর দেন সেগুলো শুনে হ্যা, হ্যা করে বা ইতিবাচক সায় দিতে থাকে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আব্দুল হককে বলেন, সিরাজ উদ্দীন কি আপনাকে কিছু বলেছে? আব্দুল হক নামের সেই ব্যক্তি উত্তরে বলে, হ্যা, সে আমাকে এখানে আসতে বারণ করে যে, সেখানে যেয়ো না, কোন প্রয়োজন নেই। আমরা সত্য পেয়ে গেছি, অর্থাৎ সেও ইসলাম ধর্ম থেকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছে অর্থাৎ সে বলে যে, আমরা সত্য পেয়ে গেছি, অর্থাৎ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছি তাই আর গবেষণার প্রয়োজন কি? আর সে এ কথাও বলেছিল যে, আমি যখন কাদিয়ান যাই আমাকে বিদায় জানানোর জন্য তিনি (আ.) তিন মাইল পর্যন্ত সঙ্গে আসেন এবং ঘর্মাক্ত হয়ে যান, অর্থাৎ সেই সিরাজ উদ্দীনকে বিদায় দেয়ার জন্য মসীহ্ মাওউদ (আ.) তিন মাইল পর্যন্ত তার সাথে যান।

এটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উন্নত আতিথেয়তা এবং মহান ব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক। বদর পত্রিকার সম্পাদক এই প্রেক্ষাপটে যেই নোট লিখেছেন তাহলো, সুস্থ প্রকৃতির মানুষের মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর স্নেহ এবং সহানুভূতি সম্পর্কে ভেবে দেখা উচিত। তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান সেই আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের ধারণা নেয়া উচিত যা তাঁর ফিতরত এবং তাঁর প্রকৃতিতে একটি প্রাণ রক্ষার জন্য ছিল। তিন মাইল পর্যন্ত তার

সাথে যাওয়া এটি কি কেবল সহানুভূতির বশবর্তী হয়েইছিল না?

অবশ্যই সহানুভূতির বশবর্তী হয়েই তাকে রক্ষা করার জন্য করেছেন নতুবা মিঞাঁ সিরাজ উদ্দীনের সাথে তার কিইবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল? কেউ যদি সুস্থ প্রকৃতির হয় তাহলে তাঁর (আ.) সহানুভূতির এই যে প্রেরণা তা দেখেই সে হিদায়াত পেতে পারে। হে সেই ব্যক্তি! যার মাঝে আমাদের জন্য সত্যিকার আন্তরিকতা এবং আবেগ-উচ্ছ্বাস বিরাজমান তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক হে শান্তির বরপুত্র।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, সে যে ঘামের কথা বলেছে তার অর্থ হলো,আমরা যেন উত্তর দিতে পারিনি। পরিতাপ! আপনার তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল, সে এখানে অবস্থানকালে নামায কেন পড়ত? সে যখন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আসে তখন সে নামাযও পড়ত। তিনি (আ.) বলেন, সে কি এ কথা বলেনি যে, আমার সামনে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে? আমার সামনে থাকলে আমি কসম দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতাম, আর সামনে থাকলে তার কিছুটা হলেও লজ্জা হতো। আব্দুল হক বলে, আমি নামাযের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে বলে যে, হ্যা, নামায পড়তাম আর সিরাজ উদ্দীন বলে, আমি বলেছিলাম কোন ঠান্ডা জায়গায় গিয়ে আমি সিদ্ধান্ত করব। খ্রিষ্টান সিরাজ উদ্দীন এ কথাও বলেছিল যে, মির্যা সাহেব খ্যাতি-প্রিয়। আমি চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম সেই চারটি প্রশ্নের উত্তর তিনি ছাপিয়ে দিয়েছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, এতে খ্যাতি-প্রিয়তার কি আছে, আমি সত্য কেন গোপন করব। সত্য গোপন করলে আমরা গুনাহ্গার গণ্য হতাম আর পাপ হতো। আল্লাহ্ তা'লা যেখানে আমাকে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে পাঠিয়েছেন সেখানে আমি অবশ্যই সত্য প্রকাশ করব আর যে দায়িত্ব আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে তা সৃষ্টির কর্ণগোচর করব। আমি আদৌ ভ্রুক্ষেপ করি না যে, কেউ আমাকে খ্যাতি-সন্ধানী বা অন্য কিছু বলবে। আপনি তাকে চিঠি লিখুন, সে যেন আরো কিছু দিন এখানে এসে অবস্থান করে।

অতএব যে কাজের প্রতি বা যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাকে পাঠিয়েছেন সেই কাজকে শুধু এক ব্যক্তি পর্যন্ত তিনি সীমাবদ্ধ রাখেন নি বরং তিনি (আ.) নিশ্চিত ছিলেন, এর ফলে অন্যদেরও উপকার হতে পারে এবং ইসলামের প্রকৃত চিত্র সুস্পষ্ট হতে পারে, তাই তিনি এই উত্তর ছাপিয়ে দেন, কোন নাম বা জশ বা খ্যাতির জন্য তিনি এমনটি করেন নি। তাঁর প্রতিটি কাজ ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর সম্মান এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল।

যাহোক, এই যুবক আব্দুল হকের সাথে ভ্রমণকালে তাঁর অনেক কথা হতো। একদিন সিরাজ উদ্দীন সংক্রান্ত কথা-বার্তা বা আলোচনা করতে করতে তিনি (আ.) ঘরের কাছে পৌঁছে আব্দুল হককে সম্বোধন করে বলেন, আপনি আমাদের অতিথি। কেবল সেই অতিথিই আরাম পেতে পারে যে কৃত্রিমতা মুক্ত। অতএব আপনার যেই জিনিসের প্রয়োজন হবে অকৃত্রিমভাবে আমাকে জানাবেন। এরপর জামাতকে সম্বোধন করে তিনি বলেন, দেখ! ইনি আমাদের অতিথি, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হবে তার সাথে একান্ত উন্নত ব্যবহার করা। আর চেষ্টা করা উচিত যেন তার কোন প্রকার কষ্ট না হয়, একথা বলে তিনি ঘরের ভেতরে চলে যান। প্রত্যেক ব্যক্তির আতিথেয়তার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে তিনি যত্নবান থাকতেন। কেউ সত্য-সন্ধানের জন্য আসলে প্রধানতঃ তিনি নিশ্চিত করতেন যেন সঠিক পয়গাম তার কর্ণগোচর হয় আর জাগতিক এবং বাহ্যিক আরাম এবং সুযোগ-সুবিধাও সে যেন পায়।

একজন রোগীকে দেখার বা দেখতে যাওয়ার একটি ঘটনা আমি তুলে ধরব, এতে বোঝা যায় যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দোয়ার প্রেক্ষাপটে অধুনা কালের পীর-ফকিরদের মত কোন বড়াই করেননি যে, আমি দোয়া করব বা আমার দোয়া গৃহীত হয় বরং খোদার একত্ববাদ এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার দর্শন এবং নিজের অবস্থাকে খোদার ইচ্ছার অধীনস্ত করার কথাই তিনি বর্ণনা করেছেন।

ঘটনার লেখক লিখছেন, ঘটনা হল, কোরাইশী সাহেব বেশ কয়েকদিন থেকে অসুস্থ হয়ে দারুল আমানে হযরত হাকীমুল উম্মত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর চিকিৎসা গ্রহণের জন্য এসেছেন, তিনি বেশ কয়েকবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে দোয়ার আকুতি করেন। তিনি (আ.) বলেন, আমরা দোয়া করব। এরপর একদিন সন্ধ্যার সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের মাধ্যমে তিনি নিবেদন করেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যিয়ারতের সম্মান পেতে চাই কিন্তু পা ফুলে যাওয়ার কারণে আমি আসতে পারব না বা যেতে পারছি না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং ১১ই আগষ্ট তার ঘরে গিয়ে তাকে দেখে আসার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষার উদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য বের হতেই খোদ্দাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় তিনি সেই ঘরে পৌঁছেন যেখানে এই ইনি অবস্থান করছিলেন আর রোগ সম্পর্কে বিভিন্ন খোঁজ-খবর নেন, এরপর তবলীগ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন (তবলীগের কোন সুযোগ তিনি হেলায় নষ্ট করতেন না, ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা তুলে ধরার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন) আমি তোমার পয়গাম পেয়ে দোয়া করেছি, কিন্তু আসল কথা হলো নিছক দোয়া কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ খোদার ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত না আসবে। অভাবীদের কতই না কষ্ট হয় কিন্তু শাসকের পক্ষ থেকে একটু বললেই আর মনোযোগ দিলেই সেই কষ্ট দূর হয়ে যায়। যাদের বিভিন্ন অভাব অনটন রয়েছে আর এর সুরাহার জন্য তারা শাসকের কাছে যায় এবং তাদের কৃপাদৃষ্টিতে তা দূরীভূত হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশেই সব কিছু সাধিত হয়।

দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়টি আমি তখন অনুভব করি যখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত আসে বা নির্দেশ আসে তিনি বলেছেন, 'উদউনী' কিন্তু একই সাথে 'আস্তাজিব লাকুম'-ও রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ বলেন, দোয়া কর আর দোয়া

গ্রহণও আমিই করব অর্থাৎ আমার সিদ্ধান্ত হলেই দোয়া গৃহীত হবে। আর এর জন্য আল্লাহ্‌র কথা মানা এবং আল্লাহ্‌র ইবাদত করা হলো শর্ত।

তিনি (আ.) বলেন, গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, বান্দার নিজের অবস্থায় এক পবিত্র পরিবর্তন আনা আর অভ্যন্তরীণভাবে আল্লাহ্‌র সাথে মিমাংসা করা। তার এটি জানা থাকা দরকার যে, পৃথিবীতে সে কোন উদ্দেশ্যে এসেছে আর সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কতটা চেষ্টা করেছে। মানুষ যতক্ষণ খোদা তা'লাকে চরম অসন্তুষ্ট না করে ততক্ষণ কোন কষ্টে নিপতিত হয় না কিন্তু মানুষ যদি নিজের মাঝে পরিবর্তন আনে তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও করুণার সাথে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন আর ডাক্তার সঠিক ঔষধ সম্পর্কে নিশ্চিৎ হয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা করুণার সাথে দৃষ্টিপাত করলেই ডাক্তারকে সঠিকভাবে তার রোগ নির্ণয় করার জ্ঞান দান করেন।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌র জন্য কিছুই কঠিন নয় বরং তাঁর পবিত্র মহিমা হলো,

إِنَّمَآ أَمْرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيْـًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿٨٣﴾

(সূরা ইয়াসীন: ৮৩) অর্থাৎ তাঁর নির্দেশই যথেষ্ট, তিনি যখন কোন কিছুর সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন যে, হয়ে যাও আর তা হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, একবার পত্রিকায় পড়েছিলাম, একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর পেন্সিল দ্বারা নখের ময়লা বের করছিল, এরফলে তার হাত ফুলে যায় আর ডাক্তার তখন হাত কাটার পরামর্শ দেয়, সে এটিকে তুচ্ছ বিষয় জ্ঞান করে, ফলাফল যা দাঁড়ায় তাহলো, সে মারা যায়। অনুরূপভাবে একদিন আমি লেখার জন্য নখ দিয়ে পেন্সিল প্রস্তুত করি দ্বিতীয় দিন যখন ভ্রমণে বের হই তখন এই ডেপুটি ইন্সপেক্টরের কথা মাথায় আসে আর একই সাথে আমারও হাত ফুলে যায়। আমি তখনই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করি আর ইলহাম হয়। তাকিয়ে দেখি আমার হাত পুরোপুরি সুস্থ, কোথায় কোন ফোলা ছিল না বা কষ্ট বাকি ছিল না। বস্তুতঃ আসল কথা হলো, আল্লাহ্ তা'লা যখন কৃপা করেন তখন আর কোন কষ্ট অবশিষ্ট থাকে না। আর এর জন্য শর্ত হলো, মানুষের নিজের মাঝে পরিবর্তন আনা। এরপর যাকে তিনি দেখেন যে, এই ব্যক্তি কল্যাণকর এক সত্তা, আল্লাহ্ তা'লা তখন তার আয়ু দীর্ঘায়িত করেন। আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন যে, তার জীবন কল্যাণকর, এরফলে পৃথিবীর কল্যাণ সাধন হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে দীর্ঘজীবি করেন। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায় কিন্তু সাধারণত আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার এমনটিই হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, আমাদের পুস্তকে এ সম্পর্কে পরিস্কারভাবে লেখা রয়েছে যে,

وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ

(সূরা আর রা'দ: ১৮) অর্থাৎ যা মানুষের জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে তা পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী হয় বা পৃথিবীতে এর অবস্থান দীর্ঘ হয়।

وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ

অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী থেকেও এটি প্রমাণিত হয়। হিজকিল নবীর পুস্তকেও এটি উল্লেখ আছে। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ অনেক মহান কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছে কিন্তু যখন সময় ঘনিয়ে আসে আর তার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে মৃত্যু দেন। সেবক বা ভৃত্যকেই দেখ, সে যদি সঠিকভাবে কাজ না করে তাহলে তার মনিব তাকে ছুটি দিয়ে দেয় বা বিদায় দিয়ে দেয়। তাই আল্লাহ্ তা'লা তাকে কেন জীবিত রাখবেন যে নিজের দায়িত্ব পালন করে না।

তিনি বলেন, আমাদের মির্যা সাহেব অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মরহুম পিতা পঞ্চাশ পর্যন্ত হেকিমী চিকিৎসা করেছেন। অথচ তার উক্তি হলো, তিনি কোন কার্যকর হেকিমী ব্যবস্থাপত্র পান নি। আসল কথা হলো, প্রতিটি বিন্দু যা মানুষের দেহে প্রবেশ করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছাড়া কোন কাজে আসতে পারে না।

তাই অনেক বেশি তওবা এবং ইস্তেগফার করা উচিত যেন খোদার কৃপা হয়।

আল্লাহ্‌র কৃপাবারি যখন বর্ষিত হয় তখন দোয়াও গৃহীত হয়। আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন যে, **দোয়া গ্রহণ করব**। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে একথাও বলেছেন যে, আমার তকদীরকে শিরোধার্য কর, তাই যতক্ষণ খোদার সিদ্ধান্ত না হয় দোয়া গৃহীত হওয়ার আশা আমি কমই রাখি। বান্দা খুবই দুর্বল এবং অসহায়, তাই খোদার কৃপাবারির প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। এরপর তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্ এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকারের প্রতিও সত্যিকার ইসলামের শিক্ষার আলোকে পথের দিশা দিয়েছেন আর সেভাবে স্বীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যেভাবে তিনি তাঁর মনিব এবং অনুসরণীয় নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে শিখেছেন।

তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অধিকারগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড় অধিকার হলো, তাঁর ইবাদত করা, আর এই ইবাদত যেন কোন ব্যক্তি-স্বার্থকেন্দ্রীক যেন না হয় বরং জান্নাত, দোযখ না থাকলেও তাঁর ইবাদত করা উচিত। আর সেই ব্যক্তিগত ভালোবাসা যা স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির থাকা উচিত তাতে যেন বিন্দুমাত্র তারতম্য না ঘটে। আজকাল মানুষ বিশেষতঃ ধর্মের বিরোধিরা অনেক আপত্তি করে যে, তোমরা তো লোভ লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে ইবাদত কর।

তিনি (আ.) বলেন, খোদাপ্রেমের বশবর্তী হয়ে এবং তাঁর ভালোবাসার কারণে তাঁর ইবাদত করা উচিত। তাই এসব অধিকারের ক্ষেত্রে জান্নাত, দোযখের প্রশ্ন আসা উচিত নয়, আল্লাহ্‌র অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন হওয়া উচিত নয় যে, আমি জান্নাত পাব, না দোযখ? বরং খোদার সাথে যেই ভালোবাসা আছে সেই ভালোবাসার দাবি হলো, তাঁর ইবাদত করা, খোদার কৃপার দাবি হলো তাঁর ইবাদত করা।

তিনি (আ.) বলেন, "মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের ক্ষেত্রে আমার ধর্ম বা

আমার রীতি হলো, যতক্ষণ শত্রুর জন্য দোয়া না করা হবে পুরোপুরি বক্ষ পরিস্কার হয় না।

ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

(সূরা মোমেন: ৬১) এতে আল্লাহ্ তা'লা কোন বিধি-নিষেধ আরোপ করেন নি যে, শত্রুর জন্য দোয়া করলে আমি তা গ্রহণ করব না বরং আমার ধর্ম হলো, শত্রুর জন্য দোয়া করাও মহানবী (সা.)-এর সুন্নত বা রীতি। হযরত উমর (রা.) এ কারণেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। মহানবী (সা.) তাঁর জন্য প্রায়শঃ দোয়া করতেন। তাই কার্পণ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত শত্রুতা পোষণ করা উচিত নয় আর কারো জন্য ক্ষতিকর হওয়া উচিত নয়।

কৃতজ্ঞতার বিষয় হলো, আমাদের এমন কোন শত্রু নেই যার জন্য অন্তত দু'তিনবার দোয়া করি নি, একজনও এমন নেই। তাই তোমাদেরকেও আমি একথাই বলব, আর এটিই তোমাদের শিখাচ্ছি। কাউকে শুধু কষ্ট দেয়ার খাতিরে কষ্ট দেয়া আর কার্পণ্যবশতঃ তার প্রতি অন্যায় শত্রুতা পোষণে খোদা তা'লা ততটাই অসন্তুষ্ট হন যেভাবে তিনি এটা পছন্দ করেন না যে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক বা সমকক্ষ করা হবে। যেভাবে তিনি তার সাথে কাউকে শরীক করাকে ঘৃণা করেন তেমনই কারো প্রতি অন্যায় শত্রুতাকেও খোদা তা'লা চরম ঘৃণা করেন। তিনি (আ.) বলেন, এক জায়গায় তিনি 'ফাসাল' চান না আরেক জায়গায় তিনি 'ওয়াসাল' চান না। অর্থাৎ এক জায়গায় তিনি দূরত্ব চান না আর এক জায়গায় তিনি মিলিত হতে চান না বা সেই মাকাম চান না যা মিলিত হওয়ার স্থান।

তিনি (আ.) বলেন, অর্থাৎ মানব জাতির পরস্পর বিচ্ছেদ আর অপর দিকে কারে তাঁর সাথেএকাকার হওয়া। মানব জাতি পরস্পর ঝগড়া করবে, বিবাদ করবে, নৈরাজ্যে লিপ্ত হবে, একজনের মুখ থাকবে এক দিকে অপরজনের ভিন্ন দিকে এটিকে বলা হয় 'ফাসাল' এটি খোদা তা'লা পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে কাউকে যুক্ত করা বা মেলানো, তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করানো, তাঁর শরীক আখ্যায়ীত করাকে বলা হয় 'ওয়াসাল', আল্লাহ্ তা'লা এটি পছন্দ করেন না।

তিনি চান না যে, মানুষ পরস্পরকে পরিত্যাগ করুক। আল্লাহ্ তা'লা চানতারা যেন মিলে মিশে থাকে, প্রেম ভালোবাসার বন্ধনে তারা জীবন যাপন করুক। তারা যেন পরস্পরকে একে অন্যের সমান মনে করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজের জন্য এক এবং অনন্যতাকে পছন্দ করেন। আল্লাহ্ চান না তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হোক। রীতি হলো, অস্বীকারককারীদের জন্য দোয়া করা, এরফলে বক্ষ পরিস্কার হয় এবং বক্ষ উন্মোচিত হয়, মনোবল দৃঢ় হয়। তাই যতদিন আমাদের জামাত এই রীতি অবলম্বন না করবে তাদের এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না। আমার মতে যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সাথে ধর্মের খাতিরে বন্ধুত্ব করে, তার উচিত আত্মীয়স্বজনের মাঝে যে পদমর্যাদায় খাটো তার সাথেও অত্যন্ত কোমল এবং নমনীয় আচরণ করা এবং তাদেরকে ভালোবাসা কেননা; খোদার মাহাত্ম্য এবং মর্যাদা হলো, তিনি পাপিদেরকেও পুণ্যবানদের সাথে ক্ষমা করেন।

অতএব তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ তোমাদের উচিত এমন জাতিসত্তায় পরিণত হওয়া যে জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"ফাইন্নাহুম কাউমুনলা ইয়াশকা জালিসুহুম" অর্থাৎ তারা এমন এক জাতি যাদের সহাবস্থানকারীরা অর্থাৎ তাদের সাথে যারা বসে তারাও দুর্ভাগ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে না। এটি সেসব শিক্ষার সার কথা যা "তাখাল্লাকু ফব আখলাকিল্লাহ্‌র' অধীনে বর্ণনা করা হয়েছে।

অতএব এ হলো কয়েকটি কথা যা আমি বর্ণনা করেছি, সেই মহান ভান্ডার থেকে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের সামনে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ অনুসারে তুলে ধরেছেন। এথেকে থেকে প্রকাশিত হয় যে, তিনি (আ.)-ই রসূল করীম (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষা অবলম্বন ও নিজের

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-ই রসূল করীম (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষা অবলম্বন ও নিজের জীবনে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শুধু খতমে নবুওয়তের ধ্বনিই উত্তোলন করেন নি বা নারা উচ্চকিত করেন নি বরং তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্ম তাঁর মনিব ও অনুসরণীয় নেতার আনুগত্যে ছিল।

জীবনে বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শুধু খতমে নবুওয়তের ধ্বনিই উত্তোলন করেন নি বা নারা উচ্চকিত করেন নি বরং তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্ম তাঁর মনিব ও অনুসরণীয় নেতার আনুগত্যে ছিল। আর এই শিক্ষা এবং এই শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করার এক ব্যাকুলতা তাঁর মাঝে বিরাজমান ছিল যেন পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারে যে, সেই আকর্ষণীয় শিক্ষা যা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এটিই সত্যিকার মুক্তির উপায়,আর স্বীয় মান্যকারীদেরকেও তিনি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নসীহত করেছেন এবং দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত হওয়ার সুবাদে আমাদের ওপর যে দায়িত্ব বর্তায়তা পালনের তৌফিক দান করুন, এবং ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ও সুন্নত অনুসারে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দানের পাশাপাশি মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা এবং মাকামের সত্যিকার জ্ঞান ও বুৎপত্তি আমাদের দান করুন যেন আমরা ইসলামের সত্যিকার চিত্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

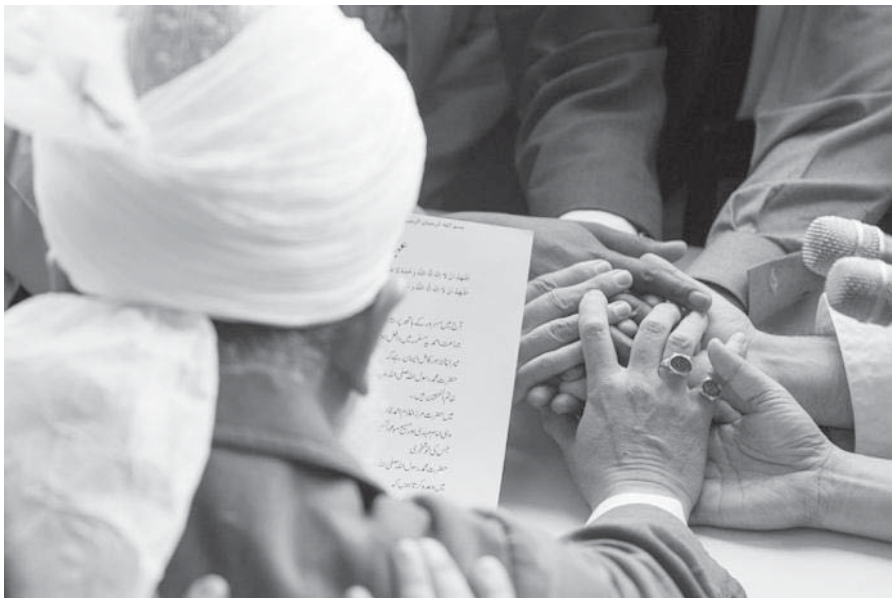

বয়আতের শর্তসমূহ এবং একজন আহমদীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

(৫ম কিস্তি)

জুলুম করো না

দ্বিতীয় শর্তে আরও আছে, জুলুম করবে না। কুরআন করীমে বর্ণিত আছে:

فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْۢ بَيْنِهِمْ ۚ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَلِيْمٍ ۝

[আয্ যুখরুফ, ৪৩:৬৬]

অনুবাদ: কিন্তু তাদের অভ্যন্তরে বিভিন্ন দল মতভেদ করে। অতএব ঐ লোকদের জন্য, যারা জুলুম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে এক কষ্টদায়ক দিনের আযাবের দূর্ভোগ।

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেছেন– মহানবী (সা.) বলেন, 'জুলুম নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকো কেননা কিয়ামত দিবসে তোমার কৃত জুলুম অন্ধকাররূপে ধেয়ে তোমার সামনে এগিয়ে আসবে। লোভ-লালসা, কৃপণতা ও বিদ্বেষপরায়নতা আত্মমর্যাদাকে আক্রান্ত করে হত্যা করায় উস্কিয়ে দেয় আর সম্মানজনক বস্তুর মানহানী ঘটায়'। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ৩য় খন্ড-৩২৩পৃষ্ঠা)

অনূরূপভাবে অন্যের অধিকার হরণ করাও জুলুম। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ বর্ণনা করেন যে, আমি নিবেদন করি, 'হে রাসূলুল্লাহ (সা.)! কোন জুলুমটি সবচেয়ে বড়?' উত্তরে মহানবী (সা.) বললেন, 'সব থেকে বড় জুলুম এটা যে, কোন ব্যক্তি নিজের ভাগের প্রাপ্য জমির অংশ থেকে একহাত পরিমান বাড়িয়ে জবর দখল করে নেয়। এমনকি সেই জমির এক টুকরা পাথরও যদি সে অন্যায়ভাবে নিয়ে থাকে, তবে সেই পাথরের তলার ঐ জমিটুকুর নীচে যা কিছু আছে তার সবটাই পরিপূর্ণ আকারে কাঁটায় পরিণত করে কিয়ামত দিবসে তার গলায় ঢুকিয়ে দেয়া হবে। জানা নেই জমির তলদেশে কত কি লুকানো আছে! পবিত্র সত্তা ব্যতিরেকে কেউই তা জানে না, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন। (মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বল, ১ম খন্ড-৪৩৯পৃষ্ঠা, বৈরুতে মুদ্রিত)

কতিপয় লোক যারা নিজেদের ভাই-বোন বা অধিনস্তদের হক না দিয়ে বিবাদ করে তাদের সহায়-সম্পদ অবৈধভাবে করায়ত্ত করে নেয়, জবর দখল করে তাদের জমি ছিনিয়ে নেয়, এমন যারা করে তাদের গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা উচিৎ। 'কারো অধিকার খর্ব করবো না বা কারো অধিকার হরন করবো না, জুলুম করবো না,' শর্তের উপর আমরা বয়'আত করে আহমদী হয়েছি, এতদসত্তেও যদি এমনটা হয়– তবে এ অবস্থা সত্যই ভীতিপ্রদ।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এক বর্ণনা করেন– মহানবী (সা.) বলেছেন, 'জানো কি! কাঙ্গাঁল কারা?' আমরা নিবেদন করলাম যার না আছে টাকা কড়ি আর না আছে কোন সহায়-সম্পদ।' মহানবী (সা.) বললেন, 'আমার উম্মতে কাঙ্গাঁল ওরা, যারা কিয়ামত দিবসে রোযা, যাকাত ইত্যাদি আমল সহকারে উপস্থিত হবে, কিন্তু কাউকে তারা গালি দিয়ে থাকবে, কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ লাগিয়ে থাকবে, কারো টাকা-কড়ি খেয়ে থাকবে আর অন্যায়ভাবে কারো রক্ত ঝরিয়ে থাকবে, কাউকে হত্যা করে থাকবে। অতএব ঐ নির্যাতন নিপীড়নকারীদের পুণ্যসমুহ তাদেরকে (নিপীড়িতদেরকে) দিয়ে দেয়া হবে। এমনকি তাদের প্রাপ্য অধিকার পূরণ করতে করতে ওদের পুণ্য নিঃশেষ হয়ে যাবে অতঃপর তাদের কৃত পাপসমূহ ওদের ঘাড়ে বর্তানো হবে। আর এভাবে জান্নাতের পরিবর্তে ওদেরকে নরকে নিক্ষেপ করা হবে। এই ব্যক্তিরাই প্রকৃত 'কাঙ্গাঁল'। (মুসলিম কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলা বাব তাহরীমিয্‌যুল্‌মে)

এখন চিন্তা করুন, গভীরভাবে ভাবুন, আমাদের প্রত্যেকেরই গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করা উচিৎ, যারাই এমন অপকর্মে

জড়িয়ে পড়েছে তাদের জন্য অত্যন্ত ভীতিপূর্ণ অবস্থা। আল্লাহ করুন, আমাদের মধ্যে, কেউ যেন এমন কাঙ্গাল অবস্থায় আল্লাহ তা'লার সমীপে কখনই উপস্থাপিত না হয়।

হযরত আকদাস মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন:

"আমার সমগ্র জামা'ত, যারা এখানে উপস্থিত আছেন বা নিজ গৃহে বাস করছেন মনযোগ দিয়ে এ উপদেশ শুনুন যে– তারা, যারা এই সিলসিলায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আমার সাথে গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক রাখেন, তারা যেন আচার-আচরণে সদাচারী ও সদালাপী হোন এবং তাকওয়ার উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছাতে সক্ষম হন। আর কোন বিশৃঙ্খলা ও দুষ্টামি বা অসচ্চরিত্রের মন্দ আচরণ তাদের ধারে কাছেও যেন ঘেঁষতে না পারে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'তের সাথে আদায়ে তারা দৃঢ় হোন, তারা যেন মিথ্যা না বলেন আর কথা দ্বারা কাউকে যেন কোন আঘাত বা খোঁচা না দেন। কোন ধরনের কুকর্মে তারা লিপ্ত হবেন না আর কোন দুষ্ট অভিসন্ধি, নির্যাতন নিপীড়ন, ঝগড়া-বিবাদের কল্পনাও হৃদয়ে ঠাঁই দেবেন না।

মোট কথা, সব ধরনের অপবাদ, অপরাধ-কর্ম, লোক দেখানো কর্ম, বাগাড়ম্বর এবং যাবতীয় স্থুল উত্তেজনা ও নিরর্থক কর্ম থেকে বিরত থাকেন এবং খোদা তা'লার পবিত্রতা হৃদয়ে ধারন করে নিজের আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে নিঃস্ব বান্দার ন্যায় হয়ে যান। আর বিষাক্ত কোন উপাদানের রেশ মাত্র তার সত্ত্বায় না থাকে এবং সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহমর্মিতা তাদের যেন নীতি হয় ও খোদা তা'লাকে ভয় করে আর নিজ কথা, নিজ হাত ও নিজ অন্তর আর নিজের ধ্যান ধারনাকে প্রত্যেক প্রকার অপবিত্রতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী অজ্ঞতা ও প্রতারণা থেকে আত্মরক্ষা করবে এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামায অত্যন্ত বিনয় ও যত্নের সাথে প্রতিষ্ঠিত রাখবে।

জুলুম নির্যাতন ও অপকৌশলের মাধ্যমে ঘুষ ও অন্যের অধিকার হরণ এবং পক্ষপাতমূলক রায় প্রদান করা থেকে দূরে থাকবে, এমন কোন মন্দ লোকের সান্নিধ্যে বসবে না, যাতে সাব্যস্ত হয় যে তার সাথে এমনি এক ব্যক্তি সখ্যতা ও বন্ধুত্ব রাখতো, যে খোদাতা'লার নির্দেশাবলীর মান্যকারী নয়... হুকুকুল ইবাদ এর (অর্থাৎ সৃষ্টির সেবার) প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপই করে না আর স্বভাবসিদ্ধ অত্যাচারী বদমেজাজি আর মন্দ আচরণকারী ব্যক্তি।

আবার সে ব্যক্তি এমনও যে, যাঁর সাথে তোমাদের বয়'আতের নির্ভরতাপূর্ণ সম্পর্ক, অকারণে তাঁর সম্পর্কে অনর্থক কটুবাক্য প্রয়োগ করে কালিমা লেপনকারী কুৎসা রটনাকে জিঁইয়ে রেখে খোদা তা'লার বান্দাদের ধোঁকা দিতে চায়। তবে তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক হবে যে 'ঐ মন্দ'কে তোমাদের মধ্য থেকে বিতাড়িত করো, এমন লোকদের বর্জন করো-এরা ভয়ঙ্কর লোক।

তোমাদের উচিৎ ধর্ম, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে কোন দলের লোকজনদেরই ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা করো না বরং প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মঙ্গলাকাঙ্খী হও। তবে তোমাদের অবশ্যই সাবধান হওয়া উচিত যাতে চক্রান্তকারী, বাটপার-সন্ত্রাসী আর দুস্কৃতিকারীরা তোমাদের মজলিসে ঢুকে না পরে বা তোমাদের বাড়ী ঘরে ঠাঁই না পায়, কেননা ওরা যে কোন সময় তোমাদের ক্ষতির কারণ হতে পারে।

অনুরূপভাবে তিনি (আ.) আরও বলেন, "এ হলো ঐ সমস্ত নির্দেশনাবলী যা আমি শুরু থেকে বলে আসছি। আমার জামা'তের প্রত্যেকের উপর বাধ্যতামূলক হলো যে, যাবতীয় এই উপদেশাবলীর প্রতি বিধিবদ্ধভাবে অনুগত থাকবে আর এটাও যথার্থ হবে যে তোমাদের মজলিস যেন অপবিত্র, অশালীন, ঠাট্টা-মশকরায় মজে না যায়, বরং পবিত্র অন্তঃকরণের অধিকারী সদাত্মা হয়ে ইহজগতে বিচরণ করো।

আর স্মরণ রেখো! প্রত্যেক চক্রান্ত প্রতিরোধের উপযোগী নয়, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমা আর ধর্তব্যে না নেয়ার অভ্যাস গড়ো। ধৈর্য ও বিনম্র গাম্ভীর্যের সাথে কাজ নাও। কারও প্রতি অন্যায়ভাবে আক্রমন করো না। অন্তরের প্রবল আবেগানুভূতী অবদমিত করে রাখো আর যদি কোন বিতর্ক ওঠে ধর্মীয় কোন কথাবার্তা হয় তবে কোমল ভাষায় আর ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে কথাবার্তা বলো। আবার অজ্ঞতা-প্রসূত জাহেলিয়তের কথাবার্তা হতে থাকলে সালাম দিয়ে সেই মজলিস থেকে দ্রুত উঠে পড়ো। তোমাদের উত্যক্ত করা হলে আর গালি-গালাজ করা হলে কিংবা তোমাদের প্রতি আরোপিত করে মন্দ থেকে মন্দতর সব কথাবার্তা বলা হলে সাবধান থেকো যে, 'মন্দ' এর সাথে মন্দ দ্বারা মুখোমুখি সংঘর্ষ যেন না বাঁধে, নইলে তোমরাও তদ্রুপই সাব্যস্ত হবে যেমনটা তারা। খোদাতা'লা চান যে তোমাদের এমন এক ঐক্যবদ্ধ জামা'ত বানিয়ে দেন, যাতে সমগ্র বিশ্বের জন্য সৎকর্মের ও সঠিক পথনির্দেশকারীর আদর্শ নমুনা রূপে তোমরা পরিগণিত হও। অতএব, নিজেদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে শীঘ্র বের করে দাও, যে বদকাজে ও দুষ্টামিতে দুস্কর্মধারী অন্তরাত্মার এক নমুনায় পরিণত হয়েছে।

আমাদের জামা'তে যে ব্যাক্তি অসচ্ছল সাদাসিধা জীবন যাপন, ধর্মপরায়ণ চাল-চলন, বিনম্র কোমল কথাবার্তা আর পাক পবিত্র সদাচারের সাথে কাল যাপন করতে পারে না, সে শীঘ্র আমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাক, কেননা আমাদের খোদা চান না যে এমন ব্যক্তি আমাদের সাথে থাকুক আর নিশ্চয় সেই ব্যক্তি দুঃসহ যন্ত্রনা নিয়ে মৃত্যুবরণ করবে, কেননা ওই ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করেনি। তাই তোমরা সাবধান হও! আর বাস্তবেও সদাত্মা ও কোমল হৃদয় এবং সঠিক পথ অবলম্বনকারী হও। তোমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায আর উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্টে পরিচিতি লাভ করবে আর যার মাঝে মন্দের বীজ রয়েছে সে এই সদুপদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারবে না"।
[প্রচারপত্র ২৯মে, ১৮৯৮, তবলীগে রেসালত ৭ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪২,৪৩]

(চলবে)

ভাষান্তর: **মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ্**

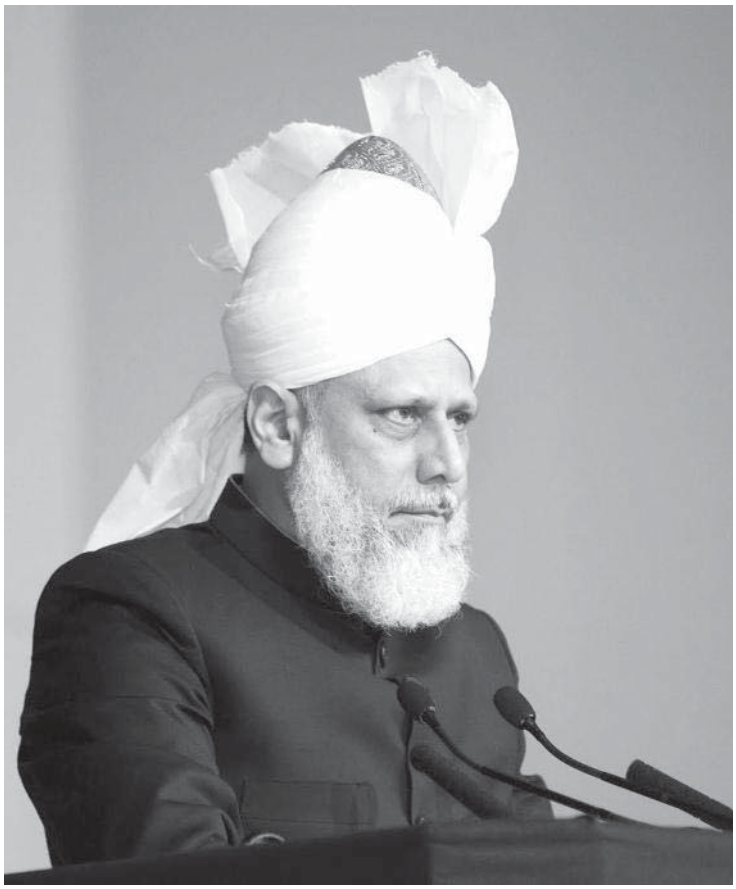

জুমুআর খুতবা

সফরে কসর নামায সম্পর্কে বিধি-নিষেধ

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২২ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, একবার হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করছিলেন যে, মানুষের জন্য দু'টো জিনিসের পরিচ্ছন্নতা অত্যাবশ্যক, একটি হলো চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতা আর অপরটি সূক্ষ্ম আবেগ-অনুভূতি এবং পুণ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত আবেগ অনুভূতির পরিচ্ছন্নতা। হৃদয়ের সাময়িক পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে মানুষের সুগভীর আবেগ-অনুভূতি-সংক্রান্ত চেতনা বা সচেতনতা অর্জন হয় না। স্থায়ী, নিষ্কলুষ এবং পূত-পবিত্র আবেগ-অনুভূতি সৃষ্টি হয় হৃদয়ের পূর্ণ স্বচ্ছতা এবং পরিচ্ছন্নতার কল্যাণে অর্থাৎ চিন্তাধারার পরিচ্ছন্নতা বা চিন্তা-ভাবনা ও ধ্যান-ধারণা সবসময় পরিষ্কার এবং স্বচ্ছ থাকা। যাকে আরাবীতে বলা হয় 'তানভীর' আর তা মন-মস্তিষ্কের পরিচ্ছন্নতা ও স্বচ্ছতার ফলে অর্জন হয়।

'তানভীর'-এর অর্থ হলো, মানুষের মাঝে এমন জ্যোতি সৃষ্টি হওয়া যার ফলে সদা পূত-পবিত্র এবং সঠিক ধ্যান-ধারণা হৃদয়ে জন্মে। চেষ্টার মাধ্যমে পবিত্র চিন্তাধারা সৃষ্টি করাকে 'তানভীর' বলা হয় না বরং 'তানভীর' হলো, এমন যোগ্যতা সৃষ্টি হওয়া যার ফলে মাথায় সবসময় সঠিক চিন্তাধারাই বিরাজ করে, কখনো ভ্রান্ত চিন্তাধারা সৃষ্টি হয় না। আর এটি জানা কথা যে, এ বিষয়গুলো অব্যাহত চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং খোদার কৃপার গুণেই সৃষ্টি হয়।

যাহোক, এ প্রেক্ষাপটে তিনি (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বরাতে বলেন, আমি স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে শুনেছি, কোন সময় যখন তাঁকে ইসলামী আইন বা ফিকাহ-সংক্রান্ত কোন বিষয় জিজ্ঞেস করা হতো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেহেতু এই বিষয়গুলো তাদের স্মরণ থাকে যারা সবসময় এমন কাজে রত থাকে তাই প্রায় সময় তিনি বলতেন, যাও মৌলভী নূরউদ্দীন সাহেবকে জিজ্ঞেস কর বা অনেক সময় মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব

মরহুমের নাম নিয়ে বলতেন, তাকে জিজ্ঞেস কর বা মৌলভী সৈয়্যদ আহসান সাহেবের নাম নিয়ে বলতেন, তাকে জিজ্ঞেস কর বা অন্য কোন মৌলভীর নাম নিতেন। আর কোন সময় যখন তিনি দেখতেন যে, এর সমাধান এমন কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে যেখানে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে তাঁর জন্য পৃথিবীকে পথের দিশা দেয়া আবশ্যক, তখন তিনি স্বয়ং এর উত্তর দিতেন।

কিন্তু কোন বিষয়ের সম্পর্ক যদি সংস্কার সংক্রান্ত বিষয়ের সাথে না থাকত তখন তিনি বলতেন, অমুক মৌলভী সাহেবকে জিজ্ঞেস কর। আর মৌলভী সাহেব সেই বৈঠকে বা সভায় উপস্থিত থাকলে তাকে বলতেন, মৌলভী সাহেব! এই এ বিষয়ের সমাধান কি? কিন্তু অনেক সময় যখন তিনি বলতেন, অমুক মৌলভী সাহেবের কাছে এ বিষয়টি জিজ্ঞেস কর তখন একই সাথে তিনি এটিও বলতেন, আমাদের ফিতরত বা প্রকৃতি অনুসারে এই বিষয়ের সমাধান এমন হওয়া উচিত। আবার এটিও বলতেন, আমাদের অভিজ্ঞতা হলো, কোন বিষয়ে আমাদের জ্ঞান নাথাকলেও আমাদের ফিতরত বা মন থেকে এ সংক্রান্ত যে ধ্বনি উত্থিত হয় পরবর্তীতে হাদীস এবং সুন্নত থেকে সেই বিষয়টি ঠিক সেভাবেই প্রমাণিত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এ বিষয়কেই 'তানভীর' বলা হয়। 'তানভীর' হলো, মানুষের মন-মস্তিষ্কে তা সঠিক চিন্তাধারার উদয় হওয়া। উদারহরণস্বরূপ এক প্রকার সুস্থতা হলো মানুষের একথা বলা যে, আমি সুস্থ আছি, আরেক প্রকার সুস্থতা হলো পরবর্তীতেও মানুষের সুস্থ থাকা। অতএব 'তানভীর' হলো চিন্তা-ধারার সেই সুস্থতার নাম যার ফলে ভবিষ্যতে যে ধ্যান-ধারণাই মাথায় উদয় হয় তা সঠিক হওয়া। তিনি বলেন, আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার জন্য আলোকিত মন-মানসিকতা আবশ্যক। আর আধ্যাত্মিকতার জন্য তাক্বওয়া এবং পবিত্রতা আবশ্যক। সত্যিকার অর্থে, মন-মস্তিষ্কের প্রেক্ষাপটে 'তানভীর' শব্দের যে অর্থ রয়েছে হৃদয়ের প্রেক্ষাপটে সেটিই তাক্বওয়ার অর্থ। মানুষ সচরাচর পুণ্য এবং তাক্বওয়াকে এক ও অভিন্ন জিনিস মনে করে। অথচ নেকী বা পুণ্য হলো, সেই সৎকর্ম যা আমরা ইতোমধ্যে করেছি বা করার ইচ্ছা রাখি। আর তাক্বওয়া হলো, ভবিষ্যতে মানুষের ভেতর যে আবেগ-অনুভূতিই সৃষ্টি হোক তা যেন নেক আর পূতঃপবিত্র হয়।

যেভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মন-মস্তিষ্কের সাথে চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা এবং অভিনিবেশ ইত্যাদির সম্পর্ক আছে, এটিই 'তানভীর' বা এটিকে বলা হয় আলোকিত হওয়া। আর আবেগ-অনুভূতি বা আকর্ষণের সবসময় পুণ্যের দিকে আকৃষ্ট থাকা আর একেই বলা হয় তাক্বওয়া। মানুষের চিন্তাধারা যদি আলোকিত হয় এবং হৃদয়ে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে সে পাপের আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকে। পাপের আক্রমন থেকে নিরাপদ হয়ে গেলে এমন মানুষ খোদার কৃপাভাজন হয়।

যেমনটি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেছেন, সাধারণ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোন কোন প্রশ্নকারীকে জামা'তের অন্যান্য আলেমের কাছে পাঠাতেন (উত্তরের জন্য)। কিন্তু অনেক প্রশ্ন এমনও আছে যা বাহ্যতঃ খুবই ছোট এবং তুচ্ছ, এক্ষেত্রে তিনি জামাতের আলেমদেরও সংশোধন করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ সফরে নামায কসর সংক্রান্ত বিষয় রয়েছে। সফর কি আর কসর সংক্রান্ত নির্দেশ বা শিক্ষা কীভাবে অনুসৃত হওয়া উচিত?

সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমার রীতি হলো, মানুষের নিজেকে অনেক বেশি সমস্যার মুখে ঠেলে দেয়া উচিত নয়। মানুষ সচরাচর যা সফর হিসেবে জানে সেটি দু'তিন মাইলের সফর হলেও সেই ক্ষেত্রে সফর এবং কসর সংক্রান্ত মাসলা-মাসায়েল তার মেনে চলা উচিত। **"ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত"** (অর্থাৎ, মানুষের কর্মের ফলাফল তার অভিপ্রায়ের ওপর নির্ভর করে) অনেক সময় আমরা আমাদের বন্ধুদের সাথে (প্রাত বা সান্ধ্য) ভ্রমনের সময় দু'তিন মাইল দূরে চলে যাই, তখন কিন্তু কারো মাথায় একথা আসে নাযে, আমরা সফরে রয়েছি। কিন্তু মানুষ যখন তার ব্যাগ গুছিয়ে সফরের উদ্দেশ্যে বের হয় বা তার জিনিসপত্র নিয়ে বের হয় তখন সে মুসাফির হয়ে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, শরীয়তের ভিত্তি কাঠিন্যের ওপর নয়। তুমি যাকে সফর মনে কর সেটিই সফর।

অতএব এ বিষয়টি এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যখন আপনি সফরের উদ্দেশ্যে বের হন সেটিই সফর। সম্প্রতি আমি এখানে (যুক্তরাজ্যে) একটি মসজিদ উদ্বোধনের জন্য যাই, খুব সম্ভব লেস্টারের মসজিদ উদ্বোধনের জন্য যাই আর সেখান থেকে ফিরে আসার পূর্বে আমি ইশার নামায পুরো পড়িয়েছি। এতে অনেকের মাথায় প্রশ্ন জেগেছে যে, **নামায কসর পড়ানো হয়নি!** তখন আমার স্মৃতিপটে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই উক্তি ছিল যে, ব্যাগ ইত্যাদি গুছিয়ে সফরের উদ্দেশ্যে বের হলেসেটিই সফর, এটি যেহেতু সত্যিকার অর্থে সফর ছিল না আর আমার যেহেতু ফিরে আসার কথা ছিল তাই আমি নামায কসর করিনি।

এছাড়া **"ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়্যাত"**-কেও আমি সামনে রেখেছি। যদি এটি সামনে থাকে তাহলে মানুষ নিজেকে বেশি কাঠিন্যের মুখেও ঠেলে দেয় না আবার সীমাতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধাও সন্ধান করে না বরং তার উদ্দেশ্য হয় আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশাবলী মেনে চলা। এই বিষয়টিকে খোলাসা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, "নিজেদের নিয়্যত এবং উদ্দেশ্য ভালোভাবে খতিয়ে দেখ। এমন সব সব ক্ষেত্রে তাক্বওয়ার প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখ। যদি কোন ব্যক্তি দৈনন্দিন ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাহিরে যায় বা এই উদ্দেশ্যে সফরে যায় তাহলে সেটি সফর নয় বরং সফর সেটি যা মানুষ বিশেষভাবে অবলম্বন করে আর কেবল এ উদ্দেশ্যেই ঘর পরিত্যাগ করে অধিকন্তু তা সফর হিসেবে বিদিত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। দেখ! আমরা সচরাচর ভ্রমনের জন্য প্রতিদিন দুই দুই মাইল পর্যন্ত পাড়ি দেই, কিন্তু এটি সফর নয়। এমন সময় হৃদয়ের প্রশান্তি কোথায় তা দেখা উচিত। যদি কোন সংশয় ছাড়াই এটি অর্থাৎ হৃদয় ফতওয়া দেয় যে, এটি সফর তাহলে কসর কর। 'ইসতাফ্‌তে ক্বালবাকা' নিজের হৃদয়ের কাছে জিজ্ঞেস কর বা নিজ হৃদয়ের কাছে ফতওয়া চাও, এরপর নেককর্ম কর।"

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, **"সহস্র সহস্র ফতওয়া থাকলেও মু'মিনের নেক অভিপ্রায় নিয়ে হৃদয়ের প্রশান্তি সন্ধান করা পছন্দনীয় বা উন্নত একটি বৈশিষ্ট্য। অতএব হৃদয়ের**

কাছে বা মনের কাছেও ফতওয়া চাওয়া উচিত।" নিয়্যত বা অভিপ্রায় পবিত্র হওয়া উচিত আর একই সাথে হৃদয়ের কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস করা উচিত।

কেউ প্রশ্ন করে যে, কোন ব্যক্তি কেন্দ্রে আসলে সে নামায কসর করবে কি না? এই প্রশ্ন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কেও করা হয়েছে আর আজও কেউ কেউ করে থাকে। অনেকের ধারণা হলো, কেন্দ্রে গেলে কসর করতে হয় না। মানুষ যখন কাদিয়ান বা রাবওয়া যেতো বা এখানে (লন্ডনের) এই কেন্দ্রেও কেউ কেউ আসে, তারা এই প্রশ্ন করে।

তিনি (আ.) বলেন, **"যে ব্যক্তি তিন দিনের জন্য এখানে আসে তার জন্য কসর করা বৈধ। আমার মতে যেই সফরে সফরের সংকল্প থাকে তা তিন চার ক্রোশের সফর হলেও সেক্ষেত্রে নামায কসর করা বৈধ। হ্যাঁ ইমাম যদি স্থানীয় হয়ে থাকেন তাহলে তার পেছনে পুরো নামায পড়তে হবে।"** অতএব যেখানেই যান, কেন্দ্র হোক বা যে স্থানই হোক না কেন যিনি নামায পড়াচ্ছেন তিনি যদি স্থানীয় হন তাহলে তিনি পুরো নামায পড়াবেন আর মুসাফিরও তার পিছনে পুরো নামায পড়বে। শাসক বা কর্মকর্তাদের ট্যুর বা সফর সফর নয়। সেসব কর্মকর্তা যারা ট্যুরে যায় তাদের সফর,সফর বলে গণ্য হবে না। তা কোন ব্যক্তির নিজের বাগানে ভ্রমন করার মত বিষয়। বিনা অকারণে বা অযথা সফরের কোন ধারণাই নেই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কীভাবে বিভিন্ন মসলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে সাহাবীদের সংশোধন করতেন সে সম্পর্কে কাজী আমীর হোসেন সাহেব (রা.) বলেন, প্রথম দিকে আমার বিশ্বাস ছিল, সফরে সাধারণ অবস্থায় নামায কসর করা বৈধ নয়, শুধু যুদ্ধের পরিস্থিতিতে ফিতনার ভয়ে নামায কসর করা বৈধ আর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের সাথে এ বিষয়ে অনেক বিতর্কেও লিপ্ত হতাম। কাজী সাহেব বলেন, সে সময় গুরুদাসপুরে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একটি মামলা বা মোকদ্দমা চলছিল, একবার আমিও সেখানে যাই। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে মৌলভী সাহেব অর্থাৎ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) এবং মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)ও ছিলেন। যোহরের নামাযের সময় হলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কাজী সাহেবকে বলেন, আপনি নামায পড়ান । তিনি বলেন, আমি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হই যে, আজ সুযোগ পেয়েছি, আমি আজ নামায কসর পড়বো না, পুরো নামায পড়ব বা পড়াব, তাহলে এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। আমি পুরো নামায পড়লে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজেই কিছু বলবেন। কাজী সাহেব বলেন, আমি এই সিদ্ধান্ত করে আল্লাহু আকবর বলার জন্য হাত উঠাই আর এই মানসে হাত উঠাই যে, নামায কসর করবো না,

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমার পেছনে ডান দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন, **তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এক পা এগিয়ে সামনে আসেন এবং আমার কানের কাছে তাঁর পবিত্র মুখ রেখে বলেন, কাজী সাহেব দু'রাকাতই পড়াবেন আশা করি।** তিনি (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, হুযূর! দু'রাকাতই পড়াব। কাজী সাহেব বলেন, তখন থেকে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায় বা আমাদের মসলার সমাধান হয়ে যায় আর আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করে নেই। অতএব এই ছিল সাহাবীদের রীতি। তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৎক্ষণাৎ বিতর্ক পরিত্যাগ করতেন। কথা প্রসঙ্গে আমি এটিও বলতে চাই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বিভিন্ন সময় ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়াদীও বর্ণনা করেছেন বা ফিকাহ্‌র বিষয়াদি বর্ণনা করেছেন। এমন নয় যে, সব বিষয়েই সমাধানের জন্য তিনি আলেমদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, তিনি নিজেও বিভিন্ন সময়ে সমাধান দিতেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি যেসব ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি বর্ণনা করেছেন তা পাকিস্তানের নেযারাত ইশাআত বড় পরিশ্রম করে কয়েকজন আলেমের সাহায্য নিয়ে যাদের মাঝে জামেয়ার অধ্যাপক এবং ছাত্ররাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এগুলো সংকলন করেছে যা 'ফিকহুল মসীহ্' নামে এখানে ছাপা হয়েছে।

এতে বিভিন্ন মসলা-মাসায়েলের সমাধান রয়েছে। এ সম্পর্কে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে বন্ধুদের এই বই ক্রয় করা উচিত। আল্লাহ্‌তা'লা তাদের পুরস্কৃত করুন যারা এসব কথা বা এমন ইসলামী আইন সংক্রান্ত বিষয়াদী বা ফিকাহ্ সংক্রান্ত বিষয়াদী এক জায়গায় সংকলন করেছেন। তারা এটিকে খুব সুন্দরভাবে সম্পাদন এবং সংকলন করেছেন। আমিও সময় পেলে বিভিন্ন সময় এই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো।

জুমুআর নামাযের সাথে যদি আসরের নামায জমা করে পড়া হয় তবুও জুমুআর নামাযের পূর্বের সুন্নতগুলো পড়া উচিত, এ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমাকে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সফরে ছিলেন, তখন প্রশ্ন করা হয়, জুমুআর সময় কতক বন্ধুর মাঝে মতভেদ বা বিতর্ক দেখা দেয় যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ফতওয়া হলো, যদি নামায জমা করা হয় তাহলে পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী আর মধ্যবর্তী সুন্নত মাফ হয়ে যায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যখন যোহর-আসর একত্রে পড়া হয় বা জমা করে পড়াহয় তখন পূর্ববর্তী এবং মধ্যবর্তী সুন্নত মাফ হয়ে যায় বা মাগরিব-ইশা যদি একত্রে পড়া হয় বা জমা করে পড়া হয় তাহলে মধ্যবর্তী এবং শেষের সুন্নত মাফ হয়ে যায়।

কিন্তু মতভেদ যা দেখা দিয়েছে তাহলো একজন বন্ধু বলেন, তিনি আমার সাথে এক সফরে ছিলেন, অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর সাথে ছিলেন, আমি জুমুআ এবং আসরের নামায জমা করিয়েছি বা একত্রে পড়েছি আর জুমুআর পূর্বের সুন্নতগুলোও পড়েছি, তো এই উভয় কথাই সঠিক। একথাও সঠিক যে, নামায জমা হওয়ার ক্ষেত্রে বা একত্রে পড়ার ক্ষেত্রে সুন্নত মাফ হয়ে যায় আর একথাও সঠিক যে, মহানবী (সা.) জুমুআর নামাযের পূর্বের সুন্নতগুলো পড়তেন, আর আমিও সফরে থাকাকালীন তা পড়েছি এবং পড়ে থাকি। এর কারণ হলো, জুমুআর নামাযের পূর্বে যে নফল পড়া হয় তা যোহরের নামাযের পূর্বের সুন্নত থেকে পৃথক। মহানবী (সা.) জুমুআর সম্মানে এই সুন্নত প্রতিষ্ঠা করেছেন।

সফরে জুমুআর নামায পড়াও বৈধ আর ছেড়ে দেয়াও বৈধ। অর্থাৎ মানুষ যদি সফরে থাকে তাহলে জুমুআ পড়তেও পারে আবার না পড়লেও চলে। কিন্তু না পড়ার অর্থ এই নয় যে, যোহরও পড়বে না, যোহর অবশ্যই পড়তে হবে। তিনি (রা.) বলেন, আমি

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সফরে জুমুআ পড়তেও দেখেছি আবার জুমুআ ছাড়তেও দেখেছি। একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি মামলা বা মোকদ্দমা উপলক্ষে গুরুদাসপুর গিয়েছিলেন। সেখানে ব্যস্ততা ছিল, তিনি (আ.) বলেন, আজকে জুমুআ হবে না কেননা; আমরা সফরে রয়েছি। এক ব্যক্তি যিনি কৃত্রিমতামুক্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আসেন এবং নিবেদন করেন, আমি শুনেছি হুযূর বলছেন যে, জুমুআ হবে না। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) তখন গুরুদাসপুরেই ছিলেন, কিন্তু সেদিন কোন কাজে তিনি কাদিয়ান ফেরত চলে গিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি ধরে নেন যে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) জুমুআ না পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন, মৌলভী সাহেবের এখানে উপস্থিত না থাকার কারণে, কারণ জুমুআ তিনিই পড়াতেন।

তাই তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলেন, হুযূর! আমিও জুমুআর নামায পড়াতে পারি। হযরত মসীহ্ মাওউদ বলেন, হ্যাঁ আপনি হয়তো পারবেন কিন্তু আমরা সফরে রয়েছি তাই যোহরের নামায পড়ছি। তিনি বলেন, হুযূর আমি খুব ভালোভাবে জুমুআর নামায পড়াতে পারি আর আমি বেশ কয়েকবার জুমুআ পড়িয়েছিও। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যখন দেখেন, এই ব্যক্তির জুমুআর নামায পড়ানোর সুগভীর আগ্রহ রয়েছে, তখন তিনি বলেন, আচ্ছা! আজকে তাহলে আমরা জুমুআ পড়ে নেই।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সফরে জুমুআ পড়তেও দেখেছি আবার জুমুআ ছেড়ে দিতেও দেখেছি। সফরে যখন জুমুআ পড়ার ক্ষেত্রে আমি নামাযের পূর্বের সুন্নতগুলো পড়ি আর আমার মতামত হলো, তা পড়া উচিত। সচরাচর এটিই ফতওয়া কেননা; এটি সাধারণ সুন্নত থেকে ভিন্ন প্রকৃতির এবং জুমুআর সম্মানে তা পড়া হয়। অতএব যদি জুমুআর নামায পড়া হয় তাহলে জুমুআ এবং আসর একত্রে পড়ার ক্ষেত্রেও খুতবার পূর্বে যেহেতু সুন্নত পড়ার রীতি রয়েছে তাই তা পড়া উচিত।

মানব জীবনে ব্যক্তিগত আনন্দের মুহূর্তও এসে থাকে,সমষ্টিগতও আর দেশীয়ও। আনন্দের সময় আনন্দের বহিঃপ্রকাশও ঘটে কিন্তু অনেকেই এক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে। অনেক ক্ষেত্রে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে অঢেল খরচ করা হয় বা ধর্মের নামে বা অন্য কোন অজুহাতে আনন্দ প্রকাশ করাকে সম্পূর্ণরূপে অবৈধ মনে করা হয়। ইসলাম এই উভয় মনোবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.), যিনি এ যুগে আমাদেরকে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে মধ্যমপন্থা শিখাতে এসেছেন, তিনি আমাদেরকে প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়েও পথের দিশা দিয়েছেন। ধর্মীয় বিষয়েও আর জাগতিক বিষয়েও।

নামাযের কথাতো আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি; এখন এক বাহ্যিক বা জাগতিক আনন্দের মুহূর্তে কীভাবে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ হওয়া উচিত আর এক্ষেত্রে তিনি কী দিক নির্দেশনা দিয়েছেন সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যেই কর্মপন্থা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তা আমি উপস্থাপন করছি। তিনি (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে আলোকসজ্জা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। আলোকসজ্জা কোন বিশেষ উপলক্ষে করা হয়ে থাকে।এই আলোকসজ্জার কথা বর্ণনা করার কারণ হলো, রানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষে আলোকসজ্জা করা হয়েছিল,বা অন্যকোন উপলক্ষে আলোকসজ্জার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, রানী ভিক্টোরিয়ার জুবিলী উপলক্ষেও আলোকসজ্জা করা হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে এমনটি করা প্রমাণিত। তিনি দু'বার রানী ভিক্টোরিয়া বা খুব সম্ভব এ্যাডওয়ার্ডের জুবিলী উপলক্ষে আলোকসজ্জা করিয়েছেন বা হয়তো এই উভয় জুবিলী রানী ভিক্টোরিয়ারই ছিল। আমার ভালোভাবে মনে পড়ে উভয় উপলক্ষেই আলোকসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, শৈশবে এমন বিষয় যেহেতু আকর্ষণীয় মনে হয় তাই আমার ভালোভাবে স্মরণ আছে, মসজিদে মোবারকের কিনারায় প্রদীপ জ্বালানো হয় আর তেল ফুরিয়ে যায়। সে যুগে এভাবে তেলের প্রদীপ জ্বালানোর রীতি ছিল। মসীহ্ মাওউদ (আ.) কাউকে বলেন, আরো কিছু তেল এবং প্রদীপ নিয়ে আসা হোক। তিনি (রা.) বলেন, আমাদের ঘরে, মসজিদে এবং মাদ্রাসায়ও প্রদীপ জ্বালানো হয়। মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেবও এর স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। তাই নিছক আলোকসজ্জার বিরোধিতার তো প্রশ্নই উঠে না। অনেকেই বলে, আলোকসজ্জা বেহুদা কাজ। তিনি (রা.) বলেন, একথা ঠিক নয়।

তিনি (রা.) বলেন, আমার বিশ্বাস হলো, হাকাম হিসেবে বা যুগের ন্যায় বিচারক হিসেবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কুরআনী শিক্ষার পরিপন্থী কোন কথাই বলতেন না আর তাঁর পক্ষ থেকে আলোকসজ্জার প্রমাণ পাওয়া যায় আর এ সম্পর্কে স্বাক্ষ্যও রয়েছে এবং আল্ হাকাম পত্রিকায়ও এটি উল্লেখিত রয়েছে। তাই বিশেষ আলোকসজ্জা সম্পর্কে কোন বিতর্কের প্রয়োজন নেই যে, কেন করা হবে?কীভাবে করা হবে? আর কখন করা হবে? অপব্যয় হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, এ দৃষ্টিকোণ থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেভাবে আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করেছেন তা নিজের মাঝে এক প্রজ্ঞার দিক রাখে, কেননা মু'মিনের প্রতিটি কাজে এটি নিহিত থাকে। আলোকসজ্জা যখন ব্যাপক পরিসরে করা হয় এবং প্রত্যেক ঘরে আলোকসজ্জা আবশ্যক আখ্যা দেয়া হয় আর এত বেশি ব্যয় করা হয় যে, এর সত্যিকার কোন উপকারী দিক সামনে না আসে তা হলে তা অবৈধ।

হ্যাঁ, দেশীও এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনে বা যেখানে বেশি আলোর প্রয়োজন সেখানে যদি এমনটি করা হয় তাহলে তাতে কোন অসুবিধা নেই। যেভাবে হযরত উমর (রা.)-এর বরাতে হযরত মীর মোহাম্মদ ইসহাক সাহেব বলেন, বিভিন্ন রেওয়ায়েতে আছে যে, হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে মসজিদে অধিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। মীর সাহেব এ সংক্রান্ত স্বাক্ষ্য দিয়েছেন যে, প্রয়োজনে মসজিদে অতিরিক্ত আলোর ব্যবস্থা করা হয়। তিনি (রা.) বলেন, মসজিদ এমন একটি স্থান যেখানে অতিরিক্ত আলোর প্রয়োজন রয়েছে। কেননা মানুষ সেখানে পবিত্র কুরআন পাঠ করে বা অন্যান্য ধর্মীয় পুস্তকাদি পাঠ করে থাকে, তাই হযরত উমর (রা.) যদি মসজিদে অধিক আলোর ব্যবস্থা করে থাকেন তাহলে

তার পিছনে একটা যুক্তি আছে বা হিকমত আছে, নতুবা আমরা দেখেছি, ইসলামে আনন্দ প্রকাশের ভাষা সেটিই অবলম্বন করা হয় যার মাধ্যমে মানব জাতির অধিক কল্যাণ সাধিত হয়। ঈদের সময় কুরবানী করা হয় যেন গরীবরা মাংস খেতে পায়। ঈদুল ফিতরের সময় ফিতরানার মাধ্যমে গরীবদের সাহায্য করা হয়।

অতএব ইসলাম যেখানেই উদযাপনের নির্দেশ দিয়েছে সেখানে এ কথার ওপরও জোর দিয়েছে যে, এটি এমনভাবে উদযাপন করা উচিত যেন দেশ ও মানব জাতির সমধিক কল্যাণ সাধন হয় কিন্তু আলোকসজ্জার মাধ্যমে এমন কোন উপকার হওয়া সম্ভব নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যে আলোকসজ্জা করিয়েছেন তার সাথে একটি রাজনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল। অনুরূপভাবে তিনি অনেক সময় আমাদেরকে বাজি বা পটকা কিনে দিতেন যেন বাচ্চাদের আনন্দের উপকরণ জোগাড় হয়। তিনি (আ.) বলতেন, গন্ধক(ধুপ) জ্বললে জীবানু মারা যায়। তাই শুধু বাচ্চাদের আনন্দিত করার জন্য নয় বরং আতশবাজীতে গন্ধক থাকে যাজ্বালানো হলে বায়ু পরিস্কার হয়, তাঁর এমনটি করার এটিও একটি কারণ ছিল। তিনি বেশ কয়েকবার আমাদেরকে পটকা এবং ফুলঝুড়ি ইত্যাদি কিনে দিয়েছেন।

যদিও এটি এক ধরনের অপব্যয় কিন্তু এতে সাময়িক উপকারিতাও রয়েছে। এতে বড় ধরনের উপকারিতা না থাকলেও অন্ততঃপক্ষে বাচ্চারা আনন্দিত হত। বাচ্চাদের আবেগ-অনুভূতিকে চাপা দিলে যে ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তা থেকে রক্ষা হত। কিন্তু তিনি পুরো জামা'তকে আতশবাজি পোড়ানোর নির্দেশ দেন নি। একথা বলেন নি যে, তোমরা আতশবাজি পোড়াও। হ্যাঁ, শিশুরা কোন সময় তা করলে কোন ক্ষতি নেই। আর বায়ু পরিস্কার করার উদ্দেশ্যে যদি তা করা হয় তাহলে উভয় স্বার্থসিদ্ধি হয়, শিশুরাও আনন্দিত হয় আর বায়ুও পরিস্কার হয়। বাচ্চারা যদি কিছুটা বিনোদনের সুযোগ পায় তাতে কোন অসুবিধা নেই। তাদের আবেগ- অনুভূতিকে নির্দয়ভাবে পিষ্ট করা উচিত নয়। শিশুদের মাঝে এই অনুভূতিও থাকা চাই যে, তাদের ক্রীড়া-কৌতুকের যে বয়স এই বয়সে ইসলাম তাদের বৈধ দাবির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে না।

যেমন আলোকসজ্জা এবং আতশবাজি ইত্যাদি যেখানে তাদের দেশেরসামগ্রীক আনন্দের অংশীদার করে সেখানে এতে দেশের সাথে এক সম্পৃক্ততাও প্রকাশ পায় আর এভাবে শিশুদের বিনোদনেরও ব্যবস্থা হয়। স্থান-কাল ভেদে ভারসাম্য বজায় রেখে বিনোদন করা বারণ নয় কিন্তু শৈশবেই বাচ্চাদের সামনে স্পষ্ট করা উচিত যে, ইসলামী শিক্ষা এবং দেশীয় আইনের গন্ডিতে থেকেই আমরা সব কিছু করি এবং করব।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর শৈশবের দু'টো ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমার সব সময় মনে থাকে, আমি তখন এক ছোট বালক ছিলাম, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মুলতান যান, তখন আমিও তাঁর সফরসঙ্গী ছিলাম, আমার বয়স ছিল সাত বা আট বছর। এই সফরের কেবল দু'টো ঘটনা আমার মনে আছে।

তিনি (রা.) বলেন, অবশ্য এমন কিছু ঘটনাও আমার মনে আছে যখন আমার বয়স কেবল দু'বছর ছিল বরং এক বন্ধু একটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন আর তাও আমার মনে পড়ে যায় অথচ তখন আমার বয়স মাত্র এক বছর ছিল। তিনি (রা.) বলেন, শৈশবের বেশ কিছু ঘটনা আমার মনে আছে কিন্তু এই সফরের কেবল দু'টি ঘটনা আমার স্মৃতিপটে জাগ্রত রয়েছে। প্রথম কথা হলো, ফিরতি পথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) লাহোরে অবস্থান করেন, সে দিনগুলোতে সেখানে মোমের নির্মিত মূর্তি প্রদর্শিত হচ্ছিল, অর্থাৎ মোম দ্বারা মূর্তি বানানো হতো যার মাধ্যমে বিভিন্ন বাদশাহ্ এবং তাদের রাজ দরবারের সচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হতো। যিনি ইংলিশ ওয়্যার হাউজের যা সেই যুগে বোম্বাই হাউজ হিসেবে পরিচিত ছিল এর মালিক ছিলেন শেখ রহমতুল্লাহ্ সাহেব।

তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন, এটি একটি শিক্ষণীয় বিষয় এবং এমন তথ্য বহুল বিষয় যাতে ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা হয়, আর যেহেতু এটি শিক্ষণীয় বিষয় তাই আপনিও দেখার জন্য চলুন। কিন্তু হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেতে অস্বীকার করেন। এরপর তিনি আমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন, আমি যেন গিয়ে এসব মূর্তি দেখে আসি।

আমি যেহেতু তখন একজন বালক ছিলাম তাই আমি মসীহ্ মাওউদ (আ.) কে বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকি যেন আমাকে এই মূর্তি দেখানো হয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমার পীড়াপীড়ির কারণে আমাকে সাথে নিয়ে সেখানে যান। যেখানে বিভিন্ন বাদশাহ্‌র জীবনের ঘটনাবলীর সচিত্র প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, যাতে কতেকের জীবন, মৃত্যু এবং রোগব্যাধির চিত্রও অঙ্কন করা হয়েছে। তিনি (রা.) বলেন, এই ঘটনা আমার স্মৃতিপটে অম্লান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিয়ে যান বা নিতে সম্মত হন এজন্য যে অনেকেই এর এমর্মে প্রশংসা করে যেএটি একটি শিক্ষণীয় এবং ঐতিহাসিক বিষয়, এটি দেখতে কোন অসুবিধা নেই। কেবল বাচ্চার পীড়াপীড়ির কারণেই চলে যান নি। যদি তিনি মনে করতেন, এটি এমন একটি কাজ যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী তাহলে বাচ্চা শত পীড়াপীড়ি করলেও তিনি যেতেন না। এটি যেহেতু শিক্ষণীয় বিষয় ছিল তাই তা দেখার জন্য বাচ্চাকে সাথে নিয়ে যান।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, দ্বিতীয় ঘটনা যা আমার মনে পড়ে তাহলো কেউ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে লাহোরে নিমন্ত্রণ করে এবং তিনি তাতে অংশগ্রহণের জন্য যান। আমার যেন মনে হয় এটি নিমন্ত্রণ ছিল না বরং মুফতি মোহাম্মদ সাদেক সাহেবের কোন সন্তান অসুস্থ ছিল যাকে দেখার জন্য তিনি গিয়েছিলেন। যাহোক, শহর হয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.) ফিরে আসছিলেন, তখন সুনেহ্‌রী মসজিদের সিঁড়ির কাছে মানুষের একটা বড় জটলা দেখি যারা গালি দিচ্ছিল, তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়েছিল, খুব সম্ভব সে কোন মৌলভী ছিল, যেভাবে মৌলভীদের অভ্যাস হয়ে থাকে সে বেজায় কোন চ্যালেঞ্জ দিচ্ছিল। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর গাড়ী যখন পাশ দিয়ে যায় তখন ভীড় দেখে আমি ভাবলাম এটি হয়তো কোন মেলা হবে। আমি দৃশ্য দেখার জন্য গাড়ী থেকে মাথা বের করি, তখনকার সেই ঘটনা আজও আমি ভুলিনি। আমি দেখেছি এক ব্যক্তি যার হাত কাটা ছিল এবং তাতে হলুদ

লাগিয়ে পট্টি বাধা ছিল, সে গভীর উত্তেজনার সাথে তার কাটা হাত দ্বিতীয় হাতের ওপর মেরে মেরে বলছিল, মির্যা পালিয়ে গেছে, মির্যা পালিয়ে গেছে।

এই ঘটনা আরেকটি বরাতে পূর্বেও আমি শুনিয়েছি। তিনি (রা.) বলেন, দেখ! এক ব্যক্তি আহত, তার হাতে পট্টি বাধা কিন্তু বিরোধিতার আতিশয্যে সে মনে করে, আমি আমার কাটা হাত দ্বারাই নাউযুবিল্লাহ্ আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন করব, নির্মূল করব, মিটিয়ে দেব বা আহমদীয়াতকে দাফন বা কবরস্ত করব। এটি কত ভয়াবহ শত্রুতা যা মানুষের হৃদয়ে বিরাজ করে। মানুষ যেন কাদিয়ান না আসে আর আহমদীয়াত গ্রহণ না করে এর জন্য হেন কোন ষড়যন্ত্র নেই যা তারা করেনি। আহমদীদের মাঝে অনেক মানুষ এমন আছে যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে কাদিয়ান আসারউদ্দেশ্যে বাটালা পর্যন্ত আসে কিন্তু মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাদেরকে ফেরত পাঠায়।

তিনি (রা.) বলেন, আমি শুনেছি, মৌলভী আব্দুল মাজেদ ভাগলপুরী সাহেবও এ কারণেই প্রথমদিকে আহমদীয়াত গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকেন। তিনি বাটালায়এলে মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভী তাকে প্ররোচিত করে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। আর এটিই মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন বাটালভীর নিত্যদিনের ব্যস্ততা ছিল। সে প্রত্যেক দিন রেলষ্টেশনে উপস্থিত হতো আর যেসব মানুষ কাদিয়ান আসার উদ্দেশ্যে ট্রেন থেকে নামতো তাদেরকে বলতো, কাদিয়ান গিয়ে কি করবে? সেখানে গেলে ঈমান নষ্ট হবে। অনেকেই তাকে আলেম মনে করে ফিরে যেত। আর মনে করত, মৌলভী মোহাম্মদ হোসেন যা বলছে সত্যই হবে। এসব কিছুই মৌলভীদের বিরোধিতার ফলশ্রুতি ছিল, তারা জনসাধারণকে এতটাই বিভ্রান্ত করে যে, সেই হাত কাটা ব্যক্তিও নারাবাজি করছিল।

এসব কিছু অর্থাৎ আলেমদের পক্ষ থেকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই যে বিরোধিতা এটি তাদের অজ্ঞতা এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে ছিল। কিন্তু ধর্মের নামে তারা মানুষকে প্ররোচিত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করছিল। অথচ যে কারণে বিরোধিতা করা হচ্ছিল বা যে কারণে আজও বিরোধিতা করা হয় এবং যে কথা বলে আলেমরা মানুষকে বিভ্রান্ত করে, মসীহ্ মাওউদ (আ.) তো এসেছেনই সেই কাজ করার জন্য, সেই কথা প্রতিষ্ঠা করার জন্য অর্থাৎ ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরা এবং মহানবী (সা.)-এর খতমে নবুওয়তের যে সুমহান মর্যাদা রয়েছে তা পৃথিবীতে সুস্পষ্ট করার জন্য এবং প্রতিষ্ঠার করার জন্য। তিনি মহানবী (সা.)-এর নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক ছিলেন এবং নিষ্ঠাবান দাস ছিলেন।

তিনি এসেছেন জগদ্বাসীকে একথা জানানোর জন্য যে, পৃথিবীর মুক্তি এখন এই শেষ রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মাধ্যমে বা তাঁর কল্যাণেই সম্ভব। কিন্তু এই নামধারী আলেমদের দুর্ভাগ্য যে, তারা এই রসূল প্রেমিকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পরিবর্তে তাঁর কথা না মেনে তাঁর ওপর এই অপবাদ আরোপ করছে যে, নাউযুবিল্লাহ্, তিনি খতমে নবুওয়তকে অস্বীকার করেন বা মহানবী (সা.) থেকে নিজের মর্যাদাকে মহান এবং বড় মনে করেন। অথচ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আচার-আচরণ এবং তাঁর শিক্ষার সাথে এসব কথার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। তিনি (আ.) সব ধর্মাবলম্বীদের চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন যে, এখন মুক্তির পথ কেবল একটিই আর তা হলো, ইসলাম গ্রহণ এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর দাসত্ব বরণ।

যাহোক, এসব আলেম-ওলামার চেষ্টা করা সত্ত্বেও জামাতের উন্নতি অব্যাহত ছিল। আর আজও এরা এমন অপচেষ্টা করছে এবং করবে কিন্তু ঐশী তকদীর হলো মহানবী (সা.) এর এই নিবেদিতপ্রাণ দাসের জামাত উন্নতি করছে এবং করতে থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন নিজেদের মাঝে সেই সত্যিকার পরিবর্তন আনয়ন করতে পারি যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের মাঝে দেখতে চান এবং প্রকৃত মুসলমানের দৃষ্টান্ত যেন আমরা স্থাপন করতে পারি, নিজেদের ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তাধারাকে আলোকিত করার চেষ্টা করুন, আর হৃদয়কে তাক্বওয়ায় পরিপূর্ণ করুন।

আজও জুমুআর পর এক ভদ্র মহিলার গায়েবানা জানাযা পড়াব, এটি শ্রদ্ধেয়া আমাতুল হাফিয রহমান সাহেবার জানাযা, যিনি সাহিঁওয়ালের সাবেক আমীর ড. আতাউর রহমান সাহেবের স্ত্রী। তিনি ২০১৬ সালের ১৫ই এপ্রিল ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন।

তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবী মিঞাঁ আযিমুল্লাহ্ সাহেবের পুত্রবধু এবং হযরত শেখ হোসেন বক্স সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন। তার পিতা জনাব মালেক মোহাম্মদ খুরশীদ সাহেব রাবওয়ার প্রথম নির্মাণ কমিটির প্রাথমিক যুগের সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল সাহিঁওয়ালের লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে খিদমতের সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার ওপর গভীর আস্থা রাখতেন, দোয়াগো, ইবাদতগুযার, গরীবদের লালন-পালনকারিনী, আর্থিক কুরবানী কুরবানীতে অগ্রগামী, খিলাফতের সাথে সুগভীর বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রাখতেন। ধৈর্যশীলা এবং খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ একজন নারী ছিলেন। সাহিঁওয়ালে আল্লাহ্ তা'লার পথে যারা বন্দি হয়েছেন এবং যে দুর্ঘটনা ঘটে সেই সময় সেখানকার আমীর ছিলেন তার স্বামী, তাই অনেকেই সাক্ষাতের জন্য তার কাছে আসতো। তিনি তাদের আতিথেয়তা করতেন। তার স্বামী ডাক্তার আতাউর রহমান সাহেব প্রায় ৪০ বছর জামাতী দায়িত্ব পালন করা অব্যাহত রাখেন। তিনি খুবই দক্ষতা এবং আন্তরিকতার সাথে তাকে সাহায্য করেছেন। কেন্দ্রীয় অতিথিদের সুগভীর যত্ন নিতেন।

সব সন্তান-সন্ততির তরবীয়ত এমনভাবে করেছেন যে তাদের সবারই খিলাফতের সাথে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি ওসীয়্যত করেছেন। তিনি পাঁচজন পুত্র এবং তিনজন কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তান-সন্ততিকে পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করুন এবং তার সব ভবিষ্যৎ প্রজন্ম জামা'তের জন্য কল্যাণকর হবে আমি এ দোয়াই করি। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

আহমদীয়া খিলাফত

মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লার তেজোদীপ্ত ঐশী শক্তির মহিমাপূর্ণ বিকাশ-স্থল

মোহাম্মদ হাবীবউল্লাহ

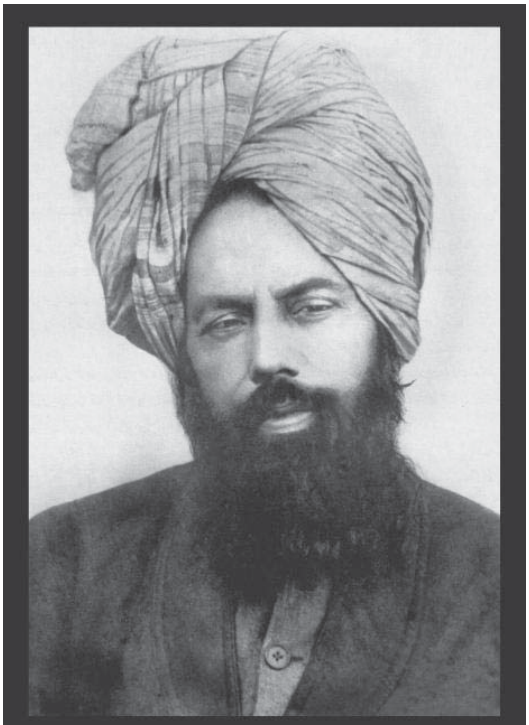

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম আখেরুজ্জামান হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)

৬২৮ ঈসাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১৪শ' বছর আগে ইসলাম প্রচার ও বিস্তারে ইতিহাসের সেই উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল, যা 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে আখ্যায়িত। তবে আল্লাহ্ তা'লা একে সুস্পষ্ট মহান বিজয় **'ফাত্হান মুবীনান'** (সূরা আল ফাতাহ্ ঃ ২) বলে ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এই ঘটনাকে ইসলামের মহান বিজয়ের মোড় রূপে চিহ্নিত করেছেন। অন্য অর্থে, হুদায়বিয়া-র প্রান্তরে মহানবী (সা.)-এর বিজয় সূচিত হয়েই গিয়েছে। সন্ধি বলবৎ থাকা কালের শান্তিময় প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.) ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানিয়ে দূতের মাধ্যমে বিভিন্ন রাজধানীতে বড় বড় সব রাজা-বাদশাহদেরকে পত্র প্রেরণ করেছিলেন।

সেকালে পারস্য সাম্রাজ্যে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ও দারুন ক্ষমতাধর সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর কাছে মহানবী (সা.)-এর দূত আব্দুল্লাহ্ বিন হুযায়ফা (রা.) ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ পত্রটি পৌঁছালে, সম্রাট খসরু উক্ত পত্রটি পাঠ করে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে সাথে সাথেই তা ছিড়ে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলে। দূত ফেরত এসে মহানবী (সা.)-কে খসরুর ধৃষ্টতাপূর্ণ সেই আচরণের কথা জানালে মহানবী (সা.) ব্যথিত হৃদয়ে যে মন্তব্য করেছেন ইতিহাসের পাতায় তা চির অম্লানরূপে আজও খোদিত হয়ে আছে। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, "খসরু আমাদের প্রেরিত পত্রের যে হাল করেছে আল্লাহ্ তা'লা তার সাম্রাজ্যের অবস্থাও তদ্রুপই করবেন।"

ইতিহাস সাক্ষী, সে সময়ে মহানবী (সা.)-এর কথা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছিল। (তাবারী তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৭২-১৫৭৪; হিশাম, পৃ ৪৬)

মহানবী (সা.)-এর মহাপরাক্রমশালী খোদা, যিনি তাঁর প্রেরিত রসূলের মর্যাদা অক্ষুন্ন ও প্রতিষ্ঠিত রাখতে জাগতিক শক্তিধর সম্রাটের সাম্রাজ্যকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়েছেন, সেই খোদা তা'লার-ই তেজোদীপ্ত ঐশী শক্তির মহিমাপূর্ণ বিকাশস্থল–আহমদীয়া খিলাফত। সূরা আলে ইমরানের ২৭ নম্বর আয়াতে **'ইন্নাকা আ'লা কুল্লে শাইয়্যিন ক্বাদীর'** (নিশ্চয় তুমি প্রত্যেক বিষয়ে সর্বশক্তিমান)উল্লেখ করা হয়েছে। এতে আল্লাহ্ তা'লার গুনবাচক নাম **'ক্বাদীর'** এর উল্লেখ হয়েছে। **'ক্বাদীর'** শব্দটির আরবী মূল হচ্ছে **'ক্বাফ, দাল, রে'** তিনটি হরফ আর এরই গভীর অর্থবোধক বর্ধিত রূপ হচ্ছে **'ক্বাদীর'**। যার অর্থ হল 'অত্যন্ত ক্ষমতাবান, মহাশক্তিশালী, সর্বময় ক্ষমতা ধারণকারী ও প্রয়োগকারী অর্থাৎ তিনি যা ইচ্ছা করেন তা-ই অকাট্য সিদ্ধান্তরূপে কার্যকর হয়ে থাকে। এমন কেউ নাই অথবা এমন কোন কিছুই নাই, যে তাঁর সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারে বা তা রদ করতে পারে।

আবার **'কুদরত'** শব্দটিও একই মূল থেকে উদ্ভূত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর রচিত পুস্তক 'আল ওসীয়্যত'-এ নিজেকে **'আল ক্বাদীর'** গুনের বিকাশস্থল বলে উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ তাঁর ব্যক্তি সত্ত্বায় **'আল ক্বাদীর'** আল্লাহ্ তা'লার মহা পরাক্রমশালী শক্তির বিকাশ ঘটেছে। আবার তিনি ঐ একই পুস্তকে **'কুদরতে সানীয়া'** শব্দসমষ্টি খিলাফতেরই সমার্থক রূপে উল্লেখ করেছেন এবং এর বিস্তারিত ব্যাখ্যাও দান করেছেন। তবে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রসঙ্গটি তিনি সরাসরি সেইভাবে না বলে 'কুদরতে সানীয়া'র উল্লেখ যেভাবে করেছেন তা একটি বিশেষ তাৎপর্য রাখে।

সেই বিশেষ তাৎপর্যটি বুঝবার জন্য আমাদেরকে গভীরভাবে দৃষ্টি দিতে হবে

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সুবিখ্যাত কাশফ (দিব্য দর্শন) **'লাল ছিটার নিদর্শন'**-এর প্রতি। এই কাশফে আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর পুনর্বিজয়ের লক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর উপস্থাপিত এক পরিকল্পপত্র অনুমোদন দিয়ে লাল কালিতে স্বাক্ষর দান করেন। উক্ত দিব্য দর্শনকালে উপস্থিত শিষ্যের পরিধেয় বস্ত্রে লালকালির ছিটা পরবার ঘটনাটি ঘটে অথচ এমন কোন উপকরণ সেখানে ছিল না। তাই এটা উজ্জ্বল এক ঐশী নিদর্শনই বটে, তবে দৃশ্যমান লাল কালির ছিটার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি আমাদের লক্ষ্য করা উচিত, তা হল অসাধারণ কী বিষয় ছিল আল্লাহ্ তা'লার অনুমোদিত সেই পরিকল্পপত্রে, যাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্ তা'লার অনুমোদন নিয়ে স্বাক্ষর গ্রহণ করেছিলেন। কী ছিল সেই পরিকল্পপত্রের দলীলে?

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) স্বয়ং উক্ত কাশফ সম্পর্কে তাঁর নিজ কথায় যা জানিয়েছেন তা দেখে নেয়া যাক। তিনি (আ.) বলেন, 'ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর ঐশী সিদ্ধান্ত সমূহ (**ক্বাযা ও ক্বদর**) আমি স্বহস্তে কাগজে লিখে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থাপন করলাম। তিনি দোয়াতের লাল কালিতে কলম চুবিয়ে আমার দিকে তাক করে কলমটি ঝাঁকি দিলেন, এরপর কলমের নিবের প্রান্তে থেকে যাওয়া লাল কালি দিয়ে উক্ত পরিকল্পপত্রের দলীলে স্বাক্ষর দান করলেন।'

এ দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয়, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমণের উদ্দেশ্য এবং তার আকাঙ্ক্ষা ও লক্ষ্য আক্ষরিক অর্থেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তা'লারই নিজের অটল ও অলঙ্ঘনীয় সিদ্ধান্ত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বুঝে-শুনে উদ্দেশ্যমূলকভাবে **'কুদরতে সানীয়া'** শব্দটি কেন ব্যবহার করেছিলেন সেই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে হলে আমাদেরকে **'খিলাফতে আলা মিনহাজেন নবুওয়ত'** (মুসনাদ আহমদ, মেশকাত) অর্থাৎ মহানবী (সা.) বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী 'নবুওয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠা' এর সাথে ইসলামের পুণর্বিজয়ের সংবদ্ধতা বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। কেননা মু'মিনদের মাঝে খিলাফত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি পবিত্র কুরআনের সূরা নূর-এর ৫৬নং আয়াতে জোরালোভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۪ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ؕ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔا ؕ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝

অর্থাৎ, "তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎ কাজ করে আল্লাহ্ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি তাদের পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। আর অবশ্যই তিনি তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়ভীতির অবস্থার পর অবশ্যই তিনি তা নিরাপত্তায় বদলে দিবেন। তারা আমার ইবাদত করবে (এবং) আমার সাথে কাউকে শরীক সাব্যস্ত করবে না। আর এরপরও যারা অকৃতজ্ঞতা করবে তারাই দুষ্কৃতকারী।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, তাঁর পরবর্তীতে যে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে, তা হবে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লার কুদরতে সানীয়ার বিকাশস্থল। তিনি **'আল ক্বাদীর'** যা ইচ্ছা করেন তা-ই সংঘটিত করেন, যার প্রতিটি ইচ্ছামাত্রই সংঘটিত হওয়া অবধারিত, এর ব্যত্যয় ঘটানোর সাধ্য কেউই রাখে না।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উর্দূ পঙতিতে কতইনা চমৎকারভাবে বলেছেন-

"কুদরতসে আপনি জাত কা দেতা হ্যায় হাক্ব সবুত,
ইস বে নিশাঁ কী চেহ্‌রা নুমায়ী এহি তো হ্যায়
জিস বাতকো কাহে কে, করুঙ্গা ইয়ে ম্যাঁয় জরুর
টালতি নেহী ওহ্ বাত, খোদায়ী এহি তো হ্যায়!"

অর্থাৎ- পরাক্রম শক্তির মহিমাপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে তিনি নিজ অস্তিত্বের প্রমাণ দেন, এরই মাধ্যমে আমরা তাঁকে শনাক্ত করতে পারি, তাঁর অদৃশ্য চেহারা দর্শন করতে পারি, তিনি যা কিছুই করতে স্থির সিদ্ধান্ত নেন তা সংঘটিত হওয়া ঠেকিয়ে দিতে পারে অথবা তার কথার নড়-চড় করে এ সাধ্য কারো নেই, একেই বলে খোদার অমোঘ বিধান!

কুদরতে সানীয়ার বিকাশ আহমদীয়া খিলাফতের দর্পনে এত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খলীফাগণের ব্যক্তিসত্ত্বায় আর খিলাফতের কার্যধারায় খুবই প্রতাপের সাথে তা প্রস্ফুটিত হয়েছে। তা থেকে মাত্র গুটি কয়েক এখানে তুলে ধরা হচ্ছে–

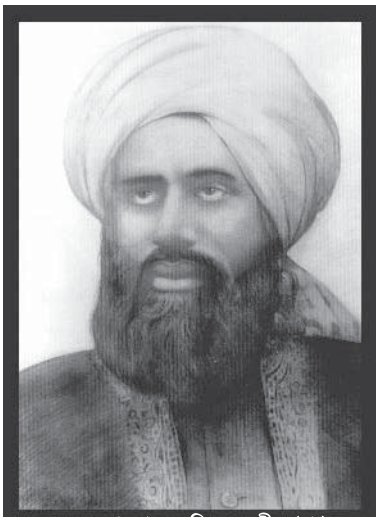

হযরত আলহাজ্ব হেকিম নূরুদ্দীন (রা.)
খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল

খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রথম খলীফা), আলহাজ্জ হেকীম হাফেয হযরত নুরুদ্দীন (রা.) খিলাফত পরিচালনায় ঘোর বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। যতটা না বাহিরের শত্রুর বিরোধিতা ছিল তার চাইতে বহুগুণ মারাত্মক ও ব্যাপক বিরোধিতা ছিল জামা'তের অভ্যন্তরে শক্তিধর ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা যাকে খিলাফতের পোশাক পরিয়েছেন, বয়সের ভারে নুঁইয়ে পড়া ঐ দূর্বল ব্যক্তিটিকেও তখন দেখা গেল অত্যন্ত নির্ভয় আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ও দৃঢ়চেতা এক ঐশী ইমাম রূপে, যাকে ঠাঁই দেয়া হয়েছে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নিশ্চিত নিরাপত্তার বলয়ে আচ্ছাদিত দূর্ভেদ্য দূর্গে। বিরোধিতার শত তুফান মোকাবেলা করেও নির্ভিকরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন এই ঐশী ইমাম, সেই সাথে সম্মুখপানে এগিয়ে নিয়েছেন তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যনিষ্ঠ এই জামা'তকে।

বিরোধী ঐ ব্যক্তিদের সম্বোধন করে বলিষ্ঠ ভাষায় তিনি বলেছেন, "আমার জীবিত থাকাকালে তোমাদেরকে কেউই খলীফা

বানাতে পারবে না, এমনকি আমার পরেও তোমাদেরকে কেউ খলীফা নির্বাচনও করতে যাবে না। আমার পরলোক গমণের পর তিনিই খলীফা হবেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং আমার পরে যিনি আসতে যাচ্ছেন তিনি তোমাদের সাথে সেই ব্যবহারই করবেন, যেমনটা করতে চান আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের সাথে।"

এরপর হুযূর (রা.) অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে বলেছেন, "শুনে রাখ! আকাশে আমার দোয়া গৃহীত হয় আর আমার প্রভু-প্রতিপালক আমার খোদা, আমার দোয়া কবুল হওয়ার আগেই ইপ্সিত প্রতিক্রিয়ার কার্যকর ফল দেখাতে শুরু করে দেন।"

তিনি (রা.) বাড়তি কথা বলেন নাই বরং স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় তিনি তাঁর কথা সুস্পষ্ট করেছেন, "আমার সাথে কোন ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পরা খোদার সাথেই বিবাদে লিপ্ত হওয়ার নামান্তর। অতএব আল্লাহ্‌র ভয়ে তোমরা তোমাদের ঐ সব মন্দ চিন্তা-ভাবনা পরিত্যাগ করে তওবা কর।"

আল্লাহ্ তা'লার প্রতিষ্ঠিত সেই মহান খলীফার বিরোধিতায় যারাই দাঁড়িয়েছিল, তাদের পরিণতি আজ আমাদের জানা, ঘটেছিল ঠিক তেমনটিই, ইরানের সম্রাট দ্বিতীয় খসরুর বেলায় যা হয়েছিল। ঐ নামগুলোর উল্লেখ আজ যতটুকুই হয়, তা কেবল ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তই বর্ণনা করে থাকে।

হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)
খলীফাতুল মসীহ্ সানী

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খিলাফতকালের প্রথমাংশে জামা'তের সার্বিক ধ্বংস সাধনের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে আহরারীরা চরম বিরোধিতা শুরু করে। এমন কি দম্ভভরে তারা বলে, কাদিয়ানের আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ইমারতগুলোর প্রতিটি ইট খুলে নিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবে তারা! আবার আহরারীরা যদিও মুসলমান তবুও কতিপয় নির্দিষ্ট হিন্দু গোত্রের সমর্থনও তারা পেয়ে যায়, সেই সাথে কিছু ব্রিটিশ সরকারী কর্মকর্তাও তাদের সাথে যোগ দেয়, এভাবে আহমদীয়াতের বিরোধিতায় তিনটি শক্তিশালী গোষ্ঠির সম্মিলিত এক বাহিনী গড়ে ওঠে। আর ইতিহাস সাক্ষী **'আল ক্বাদীর'** মহাপরাক্রমশালী খোদা জাগতিক এই শক্তিধরদের মোকাবেলায় আহমদীয়া খিলাফতকে সুরক্ষা দান করে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

১৯৩৪ ঈসাব্দে এই বিরোধিতাকারীদের শক্তি যখন ছিল আকাশচুম্বী আর তারা তাদের মারাত্মক খেলায় বিজয় উৎসব পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছিল, সেইকালে খিলাফতের পবিত্র পোশাক পরিধানকারী মহান ব্যক্তি হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) অবিচল আস্থা আর পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে ঘোষণা দিলেন, "আমি দেখছি, শত্রুদের পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, আমি তাদের সর্বাত্মক পরাজয় বরণ করা প্রত্যক্ষ করছি।" তাঁর এই ঘোষণার সপক্ষে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় সাহায্যের হস্ত এই খিলাফতের ওপর এমনভাবে সম্প্রসারিত করলেন যে, অতি দ্রুতই আহারারীরা 'নাই' হয়ে গেল, বিলুপ্তি ঘটল তাদের, ভূপৃষ্ঠ থেকেই আজ তারা অদৃশ্য, অদৃশ্য হয়েছে তাদের সব আস্ফালন। তারা আজ বিস্মৃত, তাদের নামে আজ কেবলমাত্র কানাঘুষা চলতে দেখা যায়। অপরদিকে এই দ্বিতীয় খিলাফতকালে ঐশী পরিকল্পনায় গৃহীত **'তাহরীকে জাদীদ'** কার্যক্রমের মাধ্যমে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত উপমহাদেশের গণ্ডি পেরিয়ে বহির্বিশ্বের বহুদেশে বিস্তৃতি লাভ করে।

এরপর এলো আহমদীয়াতের তৃতীয় খিলাফতকাল, যার সম্পর্কে খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) দৃঢ়তার সাথে জামা'তকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, "আমি তোমাদেরকে এই শুভ সংবাদ দিচ্ছি যে, খলীফাতুল মসীহ্ ছালেছ অর্থাৎ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের তৃতীয় খলীফা পদে যিনি অভিষিক্ত হবেন, তিনি মহান আল্লাহ্‌র প্রতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবেন, তার সাথে কোন সরকার দু:সাহস দেখিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতায় লিপ্ত হলে, তারাও হবে অবমানিত ও লাঞ্ছিত।"

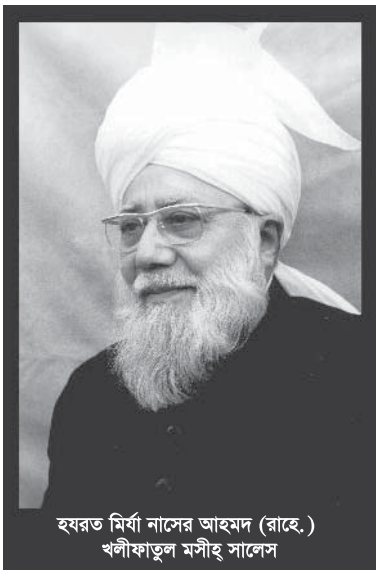
হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ্ সালেস

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ ছালেছ হযরত মির্যা নাসের আহমদ (রাহে.)-এর খিলাফতকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো, যিনি কি'না ছিলেন তুখোড় রাজনীতিবিদ, তিনি তার প্রধান মন্ত্রীত্বের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ব্যবহার করে আহমদীয়া খিলাফতের চরম বিরুদ্ধাচরণ করে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের অপচেষ্টা চালিয়েছিলেন। **'আল ক্বাদীর'** মহাপরাক্রমশালী খোদা এই খিলাফতের রক্ষক। তিনি (আল্লাহ্), পরম বিক্রমের সাথে এই খিলাফতের পোশাকের সম্মান অক্ষুন্ন রেখেছেন। ভুট্টো সংবিধানে সংশোধনী এনে সাংবিধানিকভাবে আহমদীদেরকে 'নট মুসলিম' বলে ঘোষণা করে সেই সময়, যখন পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আহমদী উচ্চপদস্থ মিলিটারী অফিসারগণ কর্মরত ছিলেন। আহমদী অফিসারদেরকে বাধ্যতামূলক অবসর দিয়ে বিদায় করতে প্রধানমন্ত্রী ভুট্টো তার নির্দেশনায় লিখেন, 'They will be wasted out' অর্থাৎ এদেরকে সমূলে উচ্ছেদ করা হবে। আর এই নির্দেশনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস-এর দৃষ্টিতে আনা হলে, হুযূর (রাহে.) দৃঢ়তার সাথে বলেন, 'আহমদীরা নির্মূল হবে না বরং নির্মূলতার প্রতিটি অর্থে এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে সে-নিজেই সমূলে উৎপাটিত হবে।'

আর এর ফলেই ভয়ঙ্কর পরিণতি ঘটে তার। তারই বশংবদ জেনারেল জিয়াউল হক, যাকে উর্ধ্বতন কয়েকজন আহমদী সেনাকর্মকর্তাকে ডিঙ্গিয়ে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব দেয় জনাব ভুট্টো। আর সেই জেনারেলই মন্তব্য করে,

'এই কুকুরকে (অর্থাৎ ভুট্টোকে) ফাঁসিতে লটকিয়ে মারব আমি'। আর এমনটা সে করেই ছাড়ে।

এখন ইতিহাসে ভুট্টো সাহেবের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলে স্পষ্টই বুঝা যায়, আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ বিধানের এই নিয়তি বড় নির্মমভাবে ভুট্টো সাহেবের জীবনে সংঘটিত হয়েছে। তারই হাতে গড়া জেনারেলের হাতে তাকে নিশ্চিহ্ন হতে হয়েছে। খিলাফতে ছালেছার প্রতি আল্লাহ্ তা'লার নিরাপত্তাদানকারী হস্ত কতইনা নিপুনভাবে তাঁকে (রাহে.) সুরক্ষা দান করেছে, নিরাপদ রেখেছে জামা'তকে আর লাঞ্ছনার অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছে ক্ষমতাধর সেই প্রধানমন্ত্রীকে।

হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে

আহমদীয়া খিলাফতের চতুর্থ খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (রাহে.)-এর খিলাফতকালে পাকিস্তানের শক্তিধর সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউল হক, খলীফাতুল মসীহ্-কে লাঞ্ছিত করার ষড়যন্ত্র আঁটে। তার ক্ষমতার দাপট এতই বেশি ছিল যে, ভুট্টোর মৃত্যুদণ্ড যেমন সে কার্যকর করেছে তেমনি আমেরিকাকেও সে এটা বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয় যে, পাকিস্তানে এই স্বৈরশাসকের শাসন আমেরিকার জন্য অত্যাবশ্যক। এই কারণে আহমদীদের নির্যাতন নিপীড়নে তার বাড় এতটাই বেড়ে যায় যে, ১৯৮৪ ঈসাব্দে সে আহমদীদের মৌলিক মানবাধিকার হরণ করে পবিত্র কলেমা পাঠ ও প্রদর্শন, মসজিদে আযান দেয়া ইত্যাদি ইসলাম ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনে নিষেধাজ্ঞা দিয়ে কুখ্যাত অর্ডিন্যান্স 'xx' জারী করে। এমনকি সে খলীফাতুল মসীহ্ রাবে-কে গ্রেফতার করার দু:সাহসও দেখায় এবং হুযূর (আই.)-কে আটক করার ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাঁর হেদায়াত ও সাহায্যপ্রাপ্ত সত্য খলীফাকে নির্বিঘ্নে নিরাপদে সেই দেশ থেকে হিজরত করিয়ে লন্ডনে পৌঁছিয়ে দেন।

যেহেতু জেনারেল জিয়াউল হককে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে বার বার আহমদীদের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানালেও সে তাতে কর্ণপাত করে নি। তাই, ঐশী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি (রাহে.) জেনারেল জিয়াকে মুবাহেলার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। কিন্তু জেনারেল জিয়াউল হক এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে কেবলই তালবাহানা করতে থাকে আর নির্যাতন করা থেকেও সে নিবৃত্ত হয় না। এই অবস্থা দৃষ্টে হুযূর (রাহে.) প্রকাশ্যে এই ঘোষণা দান করেন, "আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলছি, আমাদের মহাপরাক্রমশালী প্রভু-প্রতিপালক আমাদের সাহায্যার্থে যখন এগিয়ে আসবেন, ময়দানে তখন এমন কেউ রইবে না, যে তোমাকে সাহায্য করবে। খোদার কোপানলে যখন তুমি পড়বে তোমাকে তা টুকরো টুকরো করে ফেলবে। তোমার শনাক্তকারী সকল পরিচয়-চিহ্ন তিনি সমূলে ধ্বংস করে ফেলবেন। আর বিশ্ব তোমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ থাকবে আর অবজ্ঞার সাথে তোমাকে চিরকাল স্মরণ করবে।"

ঐশী খিলাফতের পক্ষ থেকে প্রদত্ত এই ঘোষণা আল্লাহ্ তা'লার অমোঘ নিয়তিতে শীঘ্রই প্রকাশ পেল। প্রদত্ত ঘোষণার কয়েক দিনের মধ্যেই জিয়ার সাকল্য অস্তিত্ব আকাশে সেভাবেই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল যেমনটি ঘোষিত হয়েছিল হুযূর (রাহে.)-এর দৃপ্ত কণ্ঠে। মানুষ এখন হীনভাবে অবজ্ঞাভরে তার উল্লেখ করে।

এবারে আমাদের চোখের সামনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.)-এর কল্যাণমণ্ডিত খিলাফতকালে সংঘটিত সেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তুলে ধরছি, যা আমরা এযুগে প্রত্যক্ষ করে চলছি। হুযূর (আই.) সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের বড় বড় সব রাষ্ট্রপ্রধানদেরকে আর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নেতাদেরকে, সত্য ও ন্যায়ের পথ নির্দেশ করে মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে পত্র প্রেরণ করেন। সেই সব পত্রে তিনি (আই.) কেবল সত্য ও ন্যায়ের কথাই তুলে ধরেন নি বরং এ যুগে ইসলামের

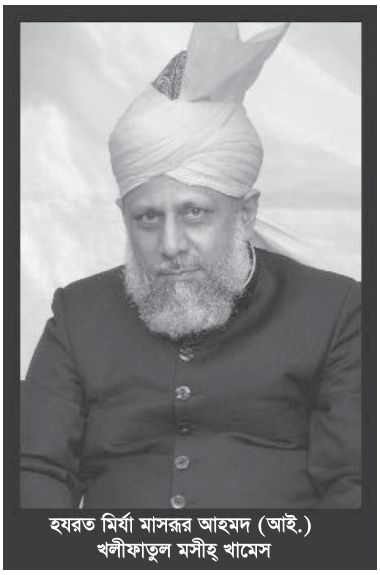
হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)
খলীফাতুল মসীহ্ খামেস

শাশ্বত ও চিরন্তন শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে যে মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে তাকে গ্রহণ করে তার আনুগত্যের জোয়াল কাঁধে নিয়ে নিশ্চিত শান্তি ও নিরাপত্তা বলয়ে বিশ্বের সকল দেশের সকল মানুষকে আশ্রয় নিতে আন্তরিক আহ্বানও জানিয়েছেন। সেই সাথে তিনি সতর্ক করেছেন তাদেরকে এই বলে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের সাবধানবাণীকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করলে তাঁর অমোঘ বিধান অনুযায়ী মারাত্মক পরিণতি তথা তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধের মহা ধ্বংস-যজ্ঞে পতিত হয়ে বর্তমান সভ্যতা বিলুপ্তির হুমকিতে পড়তে পারে।

উক্ত পত্রাবলী থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি এখানে তুলে ধরা হল-

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমেদিনেজাদকে সম্বোধন করে তিনি (আই.) লিখেন, "বিশ্বে বর্তমানে খুবই উত্তেজনা ও অস্থিরতা বিরাজ করছে। কোন কোন এলাকায় ছোট পর্যায়ে যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হয়েছে, অপরদিকে পরাশক্তিগুলো শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে বিষম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। প্রত্যেক দেশ তার কর্মকাণ্ডে অন্য কোন দেশকে হয় সমর্থন করছে, নয়তো বিরোধিতা করছে; তবে ন্যায়ের দাবী পূর্ণ করা হচ্ছে না। পরিতাপের বিষয়, যদি আমরা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি, আমরা দেখি আরেকটি বিশ্বযুদ্ধের ভিত্তি ইতোমধ্যেই রচিত হয়েছে।"

ইসরাঈলের প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি (আই.) লিখেন, "বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি এ

দিকে ইশারা করছে যে, কোন বিশ্বযুদ্ধ এখন কেবল দু'টি দেশের মধ্যে সংঘটিত হবে না, বরং জোটসমূহ গঠিত হবে। একটি বিশ্বযুদ্ধের সূচনার যে আশংকা এখন বিরাজমান তা অত্যন্ত গুরুতর। মুসলমান, খ্রিষ্টান ও ইহুদি সকলের জীবনই এতে বিপন্ন। যদি এমন যুদ্ধের সূচনা হয়েই যায় তবে তা মানবতা ধ্বংসের এক পর্যায়ক্রমিক ধারায় রূপ নেবে। ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহ এ দুর্যোগের ফল ভোগ করবে।"

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে সম্বোধন করে তিনি এই সতর্কবার্তা দেন, "আমার বিশ্বাস, আজ বিশ্বের উন্নতির দিকে মনোনিবেশ না করে, আমাদের জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যাবশ্যকীয় হলো, আমরা ধ্বংসের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার জন্য জরুরী ভিত্তিতে আমাদের প্রচেষ্টা যেন জোরদার করি। মানবজাতির জন্য আশু প্রয়োজন সেই এক-অদ্বিতীয় সত্তার অধিকারী খোদাকে চেনার, যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা; কেননা একমাত্র সেটাই মানবজাতির অস্তিত্ব রক্ষার নিশ্চয়তা দান করতে পারে; নতুবা বিশ্ব ক্রমাগত দ্রুতগতিতে আত্মহননের পথে অগ্রসর হতেই থাকবে। আমরা যদি এতে ব্যর্থ হই তাহলে এরূপ যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি কেবল এশিয়া, ইউরোপ ও দুই আমেরিকা মহাদেশের গরীব দেশগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না; বরং আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে আমাদের অপকর্মের বীভৎস পরিণতি বহন করতে হবে এবং বিশ্ব জুড়ে প্রতিবন্ধী ও বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মগ্রহণ হতে থাকবে। তারা কোনদিন তাদের সেই সব পূর্বসূরীদের ক্ষমা করবে না, যারা শিশুদেরকে সর্বগ্রাসী এক বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে গেছে। কেবলমাত্র আমাদের নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত না থেকে আমাদের উচিত আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কথা চিন্তা করা এবং তাদের জন্য এক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে সংগ্রাম করা। খোদা তা'লা আপনাকে এবং সকল বিশ্বনেতাকে এ বার্তা অনুধাবনের সুযোগ দান করুন।"

খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের বিশ্ব নেতা ষোড়শ বেনেডিক্ট-কে মানবতা সুরক্ষায় আর ধর্মীয় সহিষ্ণুতা বজায় রাখতে তিনি আহ্বান জানিয়ে লিখেন, "বিশ্বে আপনার এক প্রভাবশালী কণ্ঠস্বর রয়েছে, আমি আপনাকেও আরো বিস্তৃত পরিসরে বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য তাগিদ করছি যে, 'খোদা তা'লার প্রতিষ্ঠিত স্বাভাবিক যে ভারসাম্য, তার মধ্যে অন্তরায় সৃষ্টি করে তারা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে'। এ বাণী পূর্বের যে কোন সময়ের চেয়ে বিস্তৃত পরিসরে এবং পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বের সাথে দূর-দূরান্তে পৌঁছানো আবশ্যক। বিশ্বের সকল ধর্মের জন্য ধর্মীয় সম্প্রীতির প্রয়োজন আর বিশ্বের সকল মানুষের মাঝে ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। আমার প্রার্থনা আমরা সকলে যেন নিজ নিজ দায়িত্ব অনুধাবন করে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় এবং জগতে আমাদের স্রষ্টাকে চেনানোর প্রক্রিয়ায় নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারি। আমাদের নিজেদের হাতে দোয়ার অস্ত্র আছে, আর আমরা সর্বদা আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, পৃথিবীর ধ্বংস যেন এড়ানো যায়। আমি দোয়া করি, যে ধ্বংসযজ্ঞ আমাদের জন্য অপেক্ষমান তা থেকে আমরা যেন রক্ষা পাই।"

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের ষ্টেট কাউন্সিলের প্রিমিয়ার মি. ওয়েন জিয়াবাও-কে তিনি (আই.) লিখেন, "আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় ইসলামের সেই ফিরকা, যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সেই মসীহ্ ও সংস্কারক, এ যুগে মুসলমানদের পথপ্রদর্শনের জন্য যার মাহ্‌দীরূপে, খ্রিষ্টানদের পথ প্রদর্শনের জন্য মসীহরূপে আর সমগ্র মানবজাতির সংশোধনের জন্য সংস্কারকরূপে আবির্ভূত হওয়ার কথা ছিল, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তিনি এসে গেছেন। তিনি ভারতের কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর নাম হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)। ১৮৮৯ ঈসাব্দে তিনি সর্বশক্তিমান খোদা তা'লার আদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯০৮ ঈসাব্দে যখন তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ততদিনে লক্ষ লক্ষ মানুষ এ জামা'তে প্রবেশ করে। তাঁর মৃত্যুর পরে পুনরায় খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে ৫ম খলীফার যুগ চলছে আর আমি প্রতিশ্রুত মসীহের সেই ৫ম খলীফা।

আমরা বিশ্বাস রাখি, কেউ যদি কোন শিক্ষার প্রচার ও প্রসারে আগ্রহী হয় তবে তা কেবলমাত্র ভালোবাসা, সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ববোধের স্পৃহা নিয়ে এবং এরূপ পরিবেশে হওয়া উচিত, যেন তিনি শান্তি সমঝোতা ও সম্প্রীতির উৎসে পরিণত হন। এ গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, যা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, আহমদীয়া মুসলিম সম্প্রদায় সারা পৃথিবীতে এরই প্রচার ও প্রসার করছে। আজ বিশ্বের দুই শতাধিক দেশে বহু মিলিয়ন অনুসারী এ সম্প্রদায়ভুক্ত।

বিশ্ব আজ এক অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বস্তুত মনে হয়, আমরা দ্রুতগতিতে এক বিশ্বযুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছি।

বিশ্বের নেতৃবৃন্দ যেন প্রজ্ঞার সাথে আচরণ করেন এবং বিভিন্ন দেশের ও জাতির মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে বিদ্যমান পারস্পরিক শত্রুতাসমূহ বিস্ফোরিত হয়ে এক বিশ্বজনীন সংঘাতে পরিণত হওয়ার সুযোগ যেন না দেন। আপনার কাছেও আমার অনুরোধ, বিশ্বের এক বিশাল পরাশক্তি হিসেবে, আপনারা বিশ্ব-শান্তি প্রতিষ্ঠায় আপনাদের ভূমিকা রাখবেন। এক বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতি থেকে বিশ্বকে রক্ষা করবেন; কেননা যদি এরূপ কোন যুদ্ধের সূত্রপাত হয়, এর সমাপ্তি হবে পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহারের মাধ্যমে।

পারমাণবিক যুদ্ধের ক্ষয়-ক্ষতি ও প্রতিক্রিয়া কেবল এক নির্দিষ্ট কালের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং এর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবে ভবিষ্যত প্রজন্মসমূহ বিকলাঙ্গ বা ত্রুটিযুক্ত হয়ে জন্ম লাভ করবে। সুতরাং, মানবজাতিকে এরূপ ভীতিপ্রদ পরিণতি থেকে রক্ষা করার জন্য নিজ সর্বশক্তি, যোগ্যতা ও সম্পদ ব্যয় করুন। পরিণামে এরূপ করা আপনার জাতির জন্য কল্যাণকর সাব্যস্ত হবে। আমার দোয়া, বিশ্বের ছোট-বড় সকল দেশ এ বাণী অনুধাবন করুক।"

উপরোক্ত এই সব পত্র প্রদান, সমকালীন প্রেক্ষাপটে যেমন গুরুত্বহ তেমনি ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা পত্রগুলি প্রেরীত হয়েছে এমন এক মহান ব্যক্তির পক্ষ থেকে যিনি উপবিষ্ট রয়েছেন আসমান ও জমিনের স্রষ্টা একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিপতি **'আল ক্বাদীর'** মহাপরাক্রমশালী খোদার কোলে। আর সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ্ তা'লাই, যিনি মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর খোলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমে ঐশী খিলাফতকে সচল করেছিলেন। তিনিই হযরত মসীহ্ মাওউদ ইমাম মাহদী (আ.)-এর পর ধারাবাহিকভাবে আহমদীয়া খিলাফতের চতুর্থ পর্যায় পার করে এই পঞ্চম খিলাফতকালকেও ঐশী সাহায্য, সমর্থন ও নিদর্শনে কল্যাণমণ্ডিত করে চলছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর খিলাফতের এই চলমান ধারা যেমন আশিষপূর্ণ আহ্বান জানাচ্ছে সমগ্র বিশ্বকে তেমনি এই সকল ঘটনা প্রবাহ আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সদস্যদেরকে নিজেদের দায়িত্বের প্রতি আরো সচেতন ও মনোযোগী হতে নির্দেশ করছে। নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন ঘটিয়ে আল্লাহ্ তা'লার সান্নিধ্যলাভের প্রয়াসী হবে সকল আহমদী মুসলমানরা, প্রত্যাশিত এটাই।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত বাক্যে ব্যক্ত করেছেন, "মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে বসবাসকারী, তারা ইউরোপ অথবা এশিয়ায় যেখানেই বসবাস করুক না কেন, পবিত্রতা ও নৈতিক গুনাবলী সম্পন্ন যারা এক খোদায় বিশ্বাসী, আল্লাহ্‌র সেই সব বান্দাদেরকে একই ধর্ম বিশ্বাসে একত্রিত করাই এই জামা'তের উদ্দেশ্য।"

মহানবী (সা.)-এর সর্বাধিক বিশ্বস্ত **'গোলামে সাদিক'** হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমন, উপরোক্ত ঐ পবিত্র মিশনকে সাফল্যমণ্ডিত করা আর তাঁর খলীফাগণও সেই একই উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর রয়েছেন। আমরা যারা তাঁকে মান্য করার দাবি করি আমাদের প্রত্যেকেরই পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য হল এই মিশন সফল করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকা। বারবার যে ধ্বংসযজ্ঞ ও দুর্যোগের বিষয়ে এই বিশ্বকে ঐশী নির্দেশনায় সতর্ক করা হচ্ছে তা থেকে রক্ষা পাওয়ার একটাই উপায়, আমরা জগৎকে এ থেকে উদ্ধার করার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই আন্তরিক আহ্বান জানাতে থাকব যে, আহমদীয়া খিলাফত এযুগে ঢাল-স্বরূপ, এর মান্যতার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করুন আর সম্ভাব্য সেই চরম দুর্যোগ-দুর্ভোগ থেকে সুরক্ষিত থাকুন।

আমাদের নিজেদেরকে দূর্বল ভাবা মোটেই উচিত নয়, কেননা আমরা সেই **'আল ক্বাদীর'** মহাপরাক্রমশালী খোদার জারীকৃত ঐশী সিদ্ধান্ত, যা তিনি (আল্লাহ্) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাশ্‌ফযোগে প্রাপ্ত 'লাল ছিটা'র নিদর্শনে স্বয়ং স্বাক্ষর করেছেন, তারই বাস্তবায়নে আমরা প্রচেষ্টারত আছি। আজ থেকে ১৪শ' বছর আগে ইরানের শাহানশাহ্ দ্বিতীয় খসরুর পতন সম্পর্কে মহানবী (সা.) যে পরাক্রমশালী খোদার ওপর নির্ভর করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সেই একই খোদার নির্দেশে আমরাও আজ তাঁরই নির্দেশ বাস্তবায়নে তৎপর রয়েছি। তাহলে আমাদের ভয় কীসের!

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ইসলামের বিশাল জ্যেতির্ময় বিজয়ের আগাম সংবাদ জানিয়ে ১৯০৫ ঈসাব্দে 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকে আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন, 'তোমাদের জন্য সুসংবাদ যে, (খোদা তা'লার) নৈকট্য লাভের মাঠ শূণ্য। সবজাতিই সংসার প্রেমে মত্ত। খোদা যাতে সন্তুষ্ট হন, জগদ্বাসীর সেদিকে কোন ভ্রুক্ষেপই নেই। যাঁরা পূর্ণ উদ্যমে এই দ্বারে প্রবেশ করতে চান, তাঁদের জন্য নিজেদের সদ্‌গুণের পরিচয় দিবার ও খোদার কাছ থেকে পুরস্কার লাভের এটাই সুযোগ।

খোদা তোমাদেরকে বিনষ্ট করবেন! এটা কখনো মনে করো না। তোমরা খোদার হাতের এক বীজ বিশেষ, যা যমীনে বপন করা হয়েছে, খোদা বলেছেন ঃ–

ইয়ে বীজ বাঢ়হেগা আওর ফুলেগা আওর হর এক তারাফসে

উসকি শাখেঁ নিকলেগী আওর এক বাঢ়া দারাখ্‌ত হো জায়েগা

অর্থাৎ– 'এ বীজ বাড়বে, বড় হবে, প্রত্যেক দিকে এর শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হবে আর এক মহামহীরূহে পরিণত হবে'।

পৃথিবীর ভবিষ্যৎ আজ ইমাম আখেরুজ্জামান খাতামাল খোলাফা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত আর তাঁর ইহলোক ত্যাগের পর তাঁর মহান খলীফাগণের মান্যতায় ও আনুগত্যের মাঝে পৃথিবীর শান্তি নির্ভর করছে।

বিশ্বের কল্যাণ গভীরভাবে জুড়ে দেয়া আছে আশীষমণ্ডিত এই কার্যক্রমে অংশ নেয়া ও তাঁর আজ্ঞানুবর্তী হয়ে জীবন-যাপন করার মাঝে, যা বিশ্ব ১৪শ' বছরের এক লম্বা বিরতিকাল পেরিয়ে আসার পর পুনরায় লাভ করেছে। বর্তমানে কোন দেশ বা জাতি অথবা কোন ব্যক্তির এমনকি গোটা বিশ্বের মর্যাদা ও মূল্যমান সেই বিষয়ের ওপরই নির্ভর করছে যে, তারা আহমদীয়া খিলাফতের ও এর মিশনের উন্নয়নে নিজেদেরকে কতটা অন্তর্ভূক্ত করতে পেরেছে, কতটা সম্পৃক্ত করতে পেরেছে– এর সাথে।

সারসংক্ষেপে বলা যায় **'কুদরতে সানীয়া'** বা মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্‌র ক্ষমতার দ্বিতীয় বিকাশস্থল অনুধাবন করতে চাইলে আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ্ তা'লার পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত বাস্তবে রূপ দিতে খিলাফতের প্রতি পরিপূর্ণভাবে নিবেদিত থেকে খিলাফতের গুরুত্ব ও মর্যাদার এই কথাগুলো সবার কাছে পৌঁছাতে হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যথার্থই বলেছেন, "এই সুরক্ষিত নিরাপদ দূর্গে যারা প্রবেশ লাভ করবে, সুরক্ষা পাবে তারাই।" এ প্রসঙ্গে তাঁর আন্তরিক আহ্বান হল-

"সিদ্‌ক সে মেরী তরফ আও, ইসি মে খায়র হ্যায়,

হ্যায় দারিন্দে হার তরফ, ম্যাঁয় আফিয়াত কা হুঁ হিসার।"

অর্থাৎ- পূর্ণ বিশ্বস্ততার সাথে আমার পানে এসো, আমাতেই তুমি পাবে আশ্রয়, সকল মঙ্গল নিহিত এখানেই,

চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে হিংস্র শ্বাপদ, একমাত্র আমাতেই পাবে তুমি নিশ্চিত সুরক্ষার নিরাপদ দূর্গ।

বিশ্ব সুরক্ষিত নিরাপদ এই দুর্গে দ্রুততার সাথে আশ্রয় গ্রহণ করে মানব ও মানবতার নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করুক, আল্লাহ্ তা'লার সমীপে এটাই হলো আমাদের ব্যাকুল হৃদয়ের প্রার্থনা।

সংশোধনী

"পাক্ষিক আহমদী"র ১৫ মে ২০১৬ ঈসাব্দ সংখ্যায় 'ইসলাম আহমদীয়াত-এর ৫ম খিলাফত প্রদীপ্ত সত্যতায় উদ্ভাসিত' শীর্ষক নিবন্ধের ২৯ পৃষ্ঠার ৩য় কলামের শেষ প্যারার প্রথম দুই লাইন নিম্নরূপে পাঠ করতে হবে–

'ইসলাম আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত যাবতীয় আপতি খণ্ডন করে বর্তমানে স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল mta-তে নিয়মিতভাবে সাক্ষাৎকার ও প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। খিলাফতে খামেসার এই কালে বিষয়টি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে, কারণ এমটিএ-এর এই কার্যক্রমও ভবিষ্যদ্বাণী আকারে পূর্বেই বিদ্যমান ছিল।'

অনবধানতাবশতঃ এই ত্রুটি থাকায় আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

শবে বরাত

ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে আদৌ কোন গুরুত্ব রাখে কী?

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরান, ভারত ও বাংলাদেশে 'শবে বরাত' অত্যন্ত জমকালোভাবে পালন করা হয়। অথচ আশ্চর্যের বিষয় হলো সউদি আরবে 'শবে বরাত' বলতে কোন অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয় না। ১৫ই শাবান হলো 'শবে বরাতে'র দিন ও রাত হলো শবে বরাত। এ-রাত সম্পর্কে বলা হয়, এ রাতে প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য লিখে দেয়া হয়। তাই এ রাতে অনেক বেশী নামায পড়ে খোদাকে সন্তুষ্ট করতে হয়। এছাড়া বলা হয়, ১৫ই শাবান রসূল করীম (সা.) রোযা রাখতেন এবং রাতে কবর যিয়ারত করতেন ও বেশী নওয়াফেল পড়তেন। তাই দিনে রোযা রাখতে হবে এবং রাতে নওয়াফেল পড়তে হবে এবং কবর যিয়ারত করতে হবে। বলা হয়, এ রাতে মৃত-আত্মারা পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং তাদের আত্মীয়স্বজনদেরকে দেখে যায়। অনেকে বলেন, জান্নাতে একটি গাছ আছে, যার পাতাগুলোতে পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের নাম লেখা আছে। যে পাতাগুলো এ রাতে পড়ে যায়, সে পাতাতে যে-সব মানুষের নাম লেখা থাকে, তারা এ-বছর মারা যাবে। অনেকের মতে এ রাতে মানুষের জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়। বলা হয়, এ রাতে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে নেমে আসেন এবং বলেন, কে আছে যে, ক্ষমা চাইবে আর আমি ক্ষমা করবো। কে আছে, যে চাইবে আর আমি তাকে দিব।

শবে বরাতে হালুয়া-রুটি বানানো হয় এবং আতশবাজী পোড়ানো হয়। এ নিয়ে মুসলিম উম্মতে অনেক মতভেধ আছে। অধিকাংশের মতে এটি বিদা'ত ও কুরআন ও সুন্নাতে এর কোন ভিত্তি নেই। যারা শবে বরাত উদযাপন করে, তাদের মতে কুরআনে এর দলীল আছে। আর তা হলো সূরা দুখানের চার, পাঁচ ও ছয় নম্বর আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে- "আমরা একে নিশ্চয় এক আশিষপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। আমরা (বিপথগামীদের) সর্তক করে থাকি। আমাদের পক্ষ থেকে আদেশক্রমে (এ রাতে) প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। নিশ্চয় আমরাই রসূল প্রেরণ করে থাকি।"

তাছাড়া, তারা কিছু হাদীসও উপস্থাপন করে থাকেন। প্রায় চৌদ্দটি রেওয়ায়াত শবে বরাতের পক্ষে উপস্থাপন করা হয়। কিছু লোকদের মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে কিবলার পরিবর্তন হয়। আর সে দিনটি ছিল ১৫ই শাবান। এজন্য এ-দিনটি উদযাপন করা হয়। আজকাল আলেমগণ শবে বরাতকে সূরা দুখানের আয়াতে বর্ণিত "লায়লাতুন মুবারাকাতুন" বলে থাকে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে এ রাতের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এ-রাত সম্পর্কে যে ধ্যান-ধারনা অনেক মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে, এর কোন প্রমাণ কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসে পাওয়া যায় না। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে তো নয়ই, বরং তাবেঈনদের যুগেও এর কোন নামগন্ধ পাওয়া যায় না। শবে বরাত ইরান থেকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়েছে। 'শবে বরাত' ফার্সি শব্দটিও এদিকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে। আসলে 'লায়লাতুল কদর' এর ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করলে শবে বরাত হয়। ইসলামী ক্যালেন্ডারে শাবান হচ্ছে অষ্টম মাস। এ মাসের ১৫ তারিখ, অর্থাৎ ১৫ ই শাবান 'শবে বরাত' বলে পরিচিত। আরবে 'লায়লাতুন নিস্‌ফে মিন শাবানা' অর্থাৎ 'শাবান মাসের অর্ধেক' বলে পরিচিত।

'শব' ফারসি শব্দ। এর অর্থ হলো রাত এবং বরাতও ফার্সি শব্দ। এর অর্থ হলো ভাগ্য। এ শব্দটি কুরআন ও হাদীসের কোথাও ব্যবহার হয় নি। তবে এর বিপরীতে সূরা 'কদর' এ "লায়লাতুল কাদর" শব্দ পাওয়া যায়, যা রমযানের সাথে সম্পৃক্ত, শাবান মাসের সাথে নয়।

সূরা 'দুখানে'র যে-আয়াতটি শবে বরাত সর্ম্পকে দলীলরূপে উপস্থাপন করা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে এক ভুল ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিকর সূরা দুখানের এ-আয়াতে বলা হয়েছে– "ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিম মুবারাকাতিন, ইন্না কুন্না মুনযিরিন অর্থাৎ আমরা একে নিশ্চয় এ আশীষপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। এখানে 'হু' অর্থাৎ 'একে' সর্বনামটি কারজন্য ব্যবহার করা হয়েছে, তা নির্ণয় করতে হবে। সব মুফাস্‌সিরগণ এ সর্বনামটিকে কুরআনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে একমত। এখন প্রশ্ন হলো, কুরআন কবে অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে? শাবান মাসে না রমযানে? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলে দিয়েছেন, রমযান হচ্ছে সেই মাস, যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা বাকারা :১৮৫)

অতএব পবিত্র কুরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। উম্মতে মোহাম্মাদীয়া একমত যে, কুরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে "লায়লাতুন মুবারাকা" শাবান মাসের নয়, 'রমযান মাসের রাত'– বলে আল্লাহ্ তা'লা নির্ণয় করছেন। যাদের মতে "লায়লাতুন মুবারাকা" শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত, তারাও এ কথাটি মানেন যে, কুরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন করাই যেতে পারে এমন ভুল ব্যাখ্যা করে তারা মুসলমানদের কেন বিদাতের দিকে ঠেলে দিল? এর উত্তর আমরা এছাড়া আর কি দিতে পারি কারণ, হালুয়া রুটির সম্পর্ক সূরা দুখানের এ আয়াতের সাথে নেই। সূরা দুখানের আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তাআলা বলেন, এ রাতে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞতাপূর্ণ ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌র নির্দেশে প্রকাশ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.) , মুজাহিদ, কাতাদা ও হাসান বসরীর মতো প্রখ্যাত তাফসীরকারকগণ "লায়লাতুন মুবারাকা" বলতে "লায়লাতুল কদর"-কে আখ্যায়িত করেছেন। সূরা 'কাদর' পড়লে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'লা বলছেন

"নিশ্চয় আমরা এ কুরআন কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে যে কদরের রাত কী? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এতে ফিরিস্তারা এং পবিত্রত্মা সব-বিষয়ে তাদের প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এ এক অনাবিল শান্তি। আর এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত বিরাজ করে।"

অতএব 'শবে বরাত' বা 'লায়লাতুল মুবারাকা" হলো লায়লাতুল কদর, তা কুরআন থেকেই প্রমাণিত হয়। আর এটিও সুস্পষ্ট যে, কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার। ১৫ই শাবানের রাতের উল্লেখ কুরআনে নেই তা প্রমাণিত হলো। তফসীরকারকদের নীতি "কুরআনের একাংশ আরেকাংশের ব্যাখ্যা করে দেয়" তাও প্রমাণ করে দিল "লায়লাতুল মুবারাকা" আসলে "লায়লাতুল কাদর"। এখন প্রশ্ন উঠে যে, এ-রাতে মৃত্যু অথবা ভাগ্য নির্ধারিত হয় অথবা মৃত-আত্মীয়স্বজনদের আত্মা পৃথিবীতে আসে, এসব কি? এর উত্তর হলো, কুরআনে ও হাদীসে এর কোন উল্লেখ নেই। "লায়লাতুল কাদর" এর সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত আয়াতগুলোতে এর কোন উল্লেখ নেই। একটু চিন্তা করলেই বলা যায়, এ-সব কিছুই মনগড়া কথা। মৃত্যু সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

"আর আল্লাহ্‌র অনুমতি ছাড়া কেউ মরতে পারে না। কেননা, এর জন্য এক মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬)। তিনি আরও বলেন, "তিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন। আর, গর্ভাশয়ে যা-ই আছে, তিনি তা জানেন। আর কেউ জানে না, আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং (এটাও) কেউ জানে না কোন স্থানে সে মারা যাবে।" (সূরা লুকমান : ৩৪)

সূরা হিজরের ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'আর নিশ্চয়ই আমরাই জীবিত করি ও আমরাই মৃত্যু দেই'। তিনি বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান, তাই করেন।' (সূরা হাজ্জ : ১৫) এছাড়া আরো বহু আয়াত রয়েছে, যা থেকে জানা যায়, মৃত্যু-সম্পর্কিত বিষয়াদী আল্লাহ্ তা'লা শাবানের ১৫ তারিখে নির্ধারণ করেন না, বরং এই তকদীর বা পরিমাপ আল্লাহ্‌র হাতে এবং এটা তিনি লায়লাতুল কাদরের রাতেও নির্ধারণ করেন না। এ মেয়াদ জন্ম হতেই নির্ধারিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "নিশ্চয় আমরা সবকিছু একটি পরিমাপে সৃষ্টি করেছি। আর আমাদের আদেশ চোখের-পলক ফেলার ন্যায়, এক নিমিষেই (কার্যকর হয়)।" (সূরা কামার : ৫০) তবে মানুষের আমল, দোয়া ও খোদার নৈকট্য-প্রাপ্তির কারণে এ তকদীর দীর্ঘায়িত হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আর, যা (বা যে) মানুষের উপকার করে, তা (বা সে) পৃথিবীতে স্থায়ী হয়।" (সূরা রাআদ ১৭) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ্‌র তাকওয়া সেভাবেই অবলম্বন কর, যেভাবে তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। আর তোমরা কখনো আত্মসমর্পনকারী না হয়ে মরো না।" (সূরা আলে ইমরান : ১০৩) মৃত্যু যদি "লায়লাতুল মুবারাকাতে" নির্ধারিত হয়, তবে এ আয়াতের কি অর্থ করবেন? ইসলাম তো কর্মের কথা বলে, যা প্রতিনিয়ত করতে হয়। এ নয় যে একদিন বা এক রাতে ইবাদত কর, আর কোন এবাদতের প্রয়োজন নেই। তৌহিদ, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, তাকওয়া, দানখয়রাত এক রাত বা একদিনের ব্যাপার নয়। এ এক নিয়মিত-কর্ম। যদি এক রাতেই বছরের সব কিছু নির্ধারিত হয়, তবে এক রাতের পর সারাবছর ইবাদত আর আমলের কোন প্রয়োজন থাকে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "তুমি বল, 'হে আমার বান্দারা, যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।" (সূরা যুমার: ৫৪) এ আয়াত খোদার ক্ষমার দ্বার এক রাতের জন্য নয়, বরং প্রতিটি মুহূর্তের জন্য খুলে দিয়েছে। প্রকৃত তওবা করলে যে কোন দিন , যে-কোন রাত, যে-কোন মূহুর্তে সে খোদার কৃপার অধিকারী হতে পারে। তাই খোদার সিদ্ধান্ত-বান্দার আমলের কারণে হয়। আল্লাহর এ-সিদ্ধান্ত আমল করার পরে হয়, আমল করার আগে নয়।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "তুমি যে কল্যাণই লাভ কর, তা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আসে এবং তোমার যে অকল্যাণ হয়, তা তোমার নিজের কারণেই হয়।" (সূরা নিসা : ৮০) উদ্ধৃত কুরআনের-আয়াতগুলো এ বিষয়টি পরিষ্কার করে, সারা বছরের জন্য তকদীর নির্ধারিত হওয়া 'শবে বরাত' বা 'লায়লাতুল কদরে'-র সাথে সম্পৃক্ত নয়। ইসলামে কর্ম হলো এক চলমান প্রক্রিয়া, যা জীবনের শেষ-নিশ্বাস পর্যন্ত করে যেতে হবে। হাদিসের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই হযরত রসূলে করিম (সা.) "আইয়্যামুল বীজ" অর্থাৎ আলোকিত দিনগুলোতে প্রতিমাসে রোযা রাখতেন। আর এ দিনগুলো হলো প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ। এ সম্পর্কে বুখারী, নাসাঈ ও মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে সহীহ্ রেওয়াত রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, হযরত রসূলে করীম (সা.) শুধুমাত্র শাবানের ১৫ তারিখে রোযা রাখেন নি, বরং প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রেখেছেন। তাই প্রমাণিত হলো, ১৫ ই শাবান অর্থাৎ শবে বরাত বলে যা চালানো হচ্ছে, বিশেষ করে, এর সাথে শবে বরাত নামক দিনের রোযার কোন সম্পর্ক নেই। তবে রেওয়াত হতে জানা যায়, শাবান মাসে হযরত নবী করীম (সা.) অনেক বেশি রোযা রাখতেন। এর ব্যাখ্যায় অনেক কিছু বলা যায়। তবে রমযানের প্রস্তুতি হিসেবে যে এ-রোযাগুলো রাখতেন, এতে অধিকাংশ মুহাদ্দেসীন একমত। দ্বিতীয়ত, হযরত নবী করীম (সা.) প্রায়শই 'দাউদী রোযা' রাখতেন। আর এ নফল রোযা হলো এক দিন পর পর রাখা। বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে হযরত দাউদ (আ.)-এর রোযা ছিল উত্তম-যিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। জানা উচিত, এ হলো নফল রোযা।

তথাকথিত শবে বরাতের পক্ষে ১৪ টি হাদীস উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। মুহাদ্দেসীন ও 'আসমাউর রেযালের' (অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের সততা, স্মরণশক্তি, ইত্যাদি নির্ণয়করণ) পুস্তকাদীতে এসব রেওয়ায়েতকে "যয়ীফ" (দূর্বল) এবং "মাওযূ" (বানোয়াট) বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। এ সব হাদীসের এক বর্ণনাকারী "ইবনে আবি যাবারাহ" এর ওপর "মাওযূ" হাদীসের অপবাদ রয়েছে। হাদীসের 'আসমাউর রেযালের' ওপর হযরত ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর পুস্তক "তাকরীব"-এর ৩৯৬ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ আছে। 'আসমাউর রেযালের' ওপর বিখ্যাত পুস্তক "মীযানুল ই'তেদাল"-এতে হযরত ইমাম বুখারীর বরাতে 'শবে বরাত' সম্পর্কিত হাদীস সমূহের সনদের কয়েকজন বর্ণনাকারীকে "যয়ীফ" দুর্বল বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। সুতরাং ১৫ই শাবান সম্পর্কে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে মূল কথা হলো, যার উল্লেখ কুরআনে নেই এবং সুন্নাহ ও আসার থেকে সাব্যস্ত নয়, তা কি-ভাবে ইসলামের অংশ হতে পারে?

বলা হয়ে থাকে, ১৫ই শাবানের রাতে আল্লাহ্ তাল'লা পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হয়ে বান্দাদের ক্ষমা করার ঘোষণা দেন, দান করার ঘোষণা দেন, ইত্যাদী। জেনে রাখা উচিত, এরূপ হাদীস শুধুমাত্র ১৫ই শাবানের জন্য নির্ধারিত নয়। বরং আহাদীসে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক রাতে যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পার হয়ে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা দেন, কে আছে যে

আমার কাছে চাইবে, আর আমি তাকে দিব?...। এছাড়া 'রমযানের ফযিলত' সম্পর্কে আমরা সবাই জানি। এ মাসে জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং জান্নাতের সব দরজা খুলে দেওয়া হয়। রমযানের প্রথম ১০ দিন 'রহমতের দিন', দ্বিতীয় ১০ দিন 'মাগফেরাতের দিন' আর শেষ ১০ দিন 'নাজাতের'। আবার এর মধ্যে শেষ-দশকের বেজোড় রাতে "লায়লাতুল কাদর"ও আছে। অতএব ১৫ই শাবানের রাত সম্পর্কে যা- কিছু বলা হয়, তা হাদীস হতে প্রমাণিত, সত্য নয়। বরং এর তুলনায় রমযানের প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত এবং লায়লাতুল কাদর, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম-এর গুরুত্ব অনেক বেশী এবং হযরত নবী করীম (সা.)উম্মতের দৃষ্টি জোরালোভাবে এদিকে আকর্ষণ করেছেন।

হালুয়া রুটি এবং আতশবাজীর সাথে হযরত নবী করীম (সা.) এর দূরতম সম্পর্ক নেই। এটি এক বিদাত। আজ যারা ইসলামের নামে এসব করছে, কুরআনের এ আয়াত তাদের জন্য সর্তকবাণী উচ্চারণ করছে এবং আমাদের সবাইকে পথ-প্রদর্শন করছে। আল্লাহ বলেন, "আর নিশ্চয় তাদের মাঝে এমনও একদল আছে, যারা কিতাবের বেলায় স্বরকে (এমনভাবে) বদলায়, যেন তোমরা তা কিতাবের অংশ মনে কর, অথচ তা অংশ নয়। আর তারা বলে, এ হলো আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে। অথচ এটা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনেশুনে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে।" (সূরা আলে ইমরান : ৭৯)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সব ধরনের বিদাত থেকে মুক্ত রাখুন। (আমীন)

আসুন, পবিত্র রমযানের প্রস্তুতি গ্রহণ করি

মাহমুদ আহমদ সুমন

পবিত্র শাবান মাস চলছে। এর পরের মাসই পবিত্র রমযান। অর্থাৎ আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহের পর থেকে পবিত্র মাহে রমযান শুরু হতে যাচ্ছে। হাতে যে ক'টি দিন আছে তাকে রমযানের প্রস্তুতি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। আর না হয় রমযান এসে চলেও যাবে কিন্তু আমাদের ইবাদত-বন্দেগীতে ঘাটতি থেকে যাবে। এই পবিত্র রমযানকে স্বাগত জানানোর জন্য মু'মিন মুত্তাকির হৃদয় অধির আগ্রহে অপেক্ষমান থাকে। এ মাসে আল্লাহ্‌প্রেমিকদের আধ্যাত্মিক বাগান ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। মুসলিম জাহানের প্রাপ্ত-বয়স্ক সুস্থ-সবল নর-নারী এ পবিত্র মাসে ইবাদতের নিয়তে ছোবহে ছাদেক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার পানাহার এবং স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক মিলন হতে বিরত থেকে রোযা পালন করে থাকেন। রোযার মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন–"হে যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের জন্য রোযা ফরজ করা হলো, যেভাবে তা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের জন্য, যেন তোমরা তাক্ওয়া অবলম্বন করতে পার" (সূরাতুল বাকারা ঃ ১৮৪)।

প্রাপ্ত বয়স্ক সুস্থ-সবল মুসলিম নর-নারী, যাদের পবিত্র রমযান লাভের সৌভাগ্য অর্জিত হবে, তাদের উচিত, অবজ্ঞা-অবহেলা আর কোন প্রকার বাহানার আশ্রয় না নিয়ে রোযা রাখা। কেননা মানুষ মরণশীল, যে রমযান আমরা লাভ করতে যাচ্ছি তা জীবনে দ্বিতীয়বার ফিরে না আসার সম্ভাবনাই বেশি। রমযান এমন একটি মাস, যে মাসের সাথে অন্য কোন মাসের তুলনা চলে না। কুরআন করীমে বর্ণিত হয়েছে ঃ– 'রমযান সেই মাস যে মাসে নাযিল হয়েছে কুরআন, যা মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেউ এ মাসকে পায়, সে যেন এতে রোযা রাখে; (বাকারা ঃ ১৮৬)। মানব হৃদয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, ভক্তি ও তাক্ওয়ার মান বাড়াতে রোযা লবণ সদৃশ্য। রোযা রোযাদারের যাবতীয় পাপ মোচন করে জান্নাত লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করে। 'হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত নবী করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিশ্বাসের আন্তরিকতায় ও উত্তম ফল লাভের বাসনায় রমযান মাসে রোযা রাখে, তার পূর্বের সর্বপ্রকার পাপ ক্ষমা করা হবে', (বুখারী, মুসলিম)।

হাদীস পাঠে জানা যায়, 'রোযা ধৈর্যের অর্ধেক আর ধৈর্য ঈমানের অর্ধেক। ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে রমযানের রোযা স্রষ্টার সাথে বান্দার সাক্ষাৎ লাভের মাধ্যম হিসেবে সর্বশ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। আর এজন্যই হযরত রসূল করীম (সা.) হাদীসে কুদসীর মাধ্যমে এরশাদ করেছেন। 'সম্মান ও মর্যাদার প্রভু আল্লাহ্ বলেন, 'মানুষের অন্য সব কাজ তার নিজের জন্য, কিন্তু রোযা একান্তই আমার জন্য এবং আমি এর জন্য তাকে পুরস্কৃত করব'। রোযা ঢাল স্বরূপ। তাঁর নামে বলছি, যাঁর হাতে মুহাম্মদের জীবন, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র নিকট মেশকের গন্ধের চেয়েও পবিত্র। একজন রোযাদার দু'টি আনন্দ লাভ করে। সে আনন্দিত হয় যখন সে ইফতার করে এবং রোযার কল্যাণে সে আনন্দিত হয় যখন সে তার প্রভূর সাথে মিলিত হয় (বুখারী)।

কুরআন শরীফ হতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্যশীলদেরকে বেহিসাব সওয়াব দান করবেন। রোযা পালন করার ফলে রোযাদার ধৈর্যের চূড়ান্ত নমুনা পেশ করেন। হাদীসে কুদসী হতে আরো জানা যায় যে, হযরত রাসূলে পাক (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ বলেন, রোযাদার তার ভোগ-লিপ্সা এবং পানাহার শুধুমাত্র আমার জন্যই বর্জন করে, সুতরাং রোযা আমার উদ্দেশ্যেই আর আমিই এর প্রতিদান (মুসলিম)। এছাড়া পবিত্র মাহে রমযানের রোযা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক কল্যাণই লাভ হয় না বরং এতে দৈহিক শক্তিরও বিকাশ ঘটে। তাইতো রোযা-পালন সম্পর্কে যেমন রয়েছে মহান আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ, অন্যদিকে রয়েছে অসংখ্য পার্থিব-কল্যাণ। যেভাবে হাদীসে উল্লেখ আছে 'তোমরা রোযা রাখ, তাহলে সুস্থ্য থাকতে পারবে।' এছাড়াও রোযা যে মানব জাতির রোগমুক্তির কারণ, তা বহু হাদীসে প্রমাণিত

আর আজ চিকিৎসাবিজ্ঞানও রোযার অপরিহার্যতা স্বীকার করে।

আমরা জানি, মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, তার দৈহিক গঠন-প্রকৃতি ও স্থিতিশীলতায় অবদান রাখে সত্য, কিন্তু এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর কাজের একটা সীমাবদ্ধতা আছে। যেমন সীমাবদ্ধতা আছে মানুষের দৈহিক কাজকর্মে। উদাহরণস্বরূপ, কোন মানুষ যখন অনেক সময় পর্যন্ত কাজ করতে থাকে, তখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। সে যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম নিতে পারে, তাহলে আবার কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সতেজতা ফিরে পায়। ঠিক তেমনিভাবে মানুষের অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ; যেমন: জিহ্বা, লালাগ্রন্থি, হৃৎপিণ্ড, কিডনি, পাকস্থলী, কোষ, লিভার, মূত্রথলি, প্রভৃতিরও কাজের একটা নির্দিষ্ট প্রকৃতি, পরিমাণ ও সীমাবদ্ধতা আছে। অর্থাৎ মানুষ যখন সকাল-বিকালের নাস্তাসহ দুপুর ও রাতে খাবার খায়, তখন স্বভাবতই সর্বাবস্থায় তার উদর পূর্ণ থাকে বা উদরে খাদ্যকণা অবস্থান করে থাকে। আর এই খাদ্যকণাগুলোকে হজম করার জন্য মানবদেহের অভ্যন্তরীণ সামান্য লালাগ্রন্থি থেকে শুরু করে পাকস্থলী পর্যন্ত অনবরত কাজ করে থাকে। এমনকি পেটে যদি একটি সরিষা পরিমাণ খাদ্যকণাও অবশিষ্ট থাকে, তাহলেও এই সামান্য খাদ্যকণাকে হজম করার জন্য অভ্যন্তরীণ সবকিছুই একসঙ্গে কাজে লেগে যায়। ফলে এগুলো কখনও ন্যূনতম বিশ্রামের সুযোগও পায় না এবং ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে বদহজম থেকে শুরু করে উচ্চ-রক্তচাপ, বহুমূত্র, পিত্তথলিতে পাথর, বাত, হাঁপানি, পেপটিক আলসার, করোনারি হৃদরোগ ও মাইগ্রেইনসহ অনেক জটিল রোগ হতে পারে।

কিন্তু এক্ষেত্রে রোযা এমন একটি মাধ্যম, যা মানবদেহের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য রক্ষাসহ সব ধরনের রোগ প্রতিরোধে সক্ষম। কারণ পূর্ণ এক মাস রোযা রাখার পর ওইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈনিক প্রায় ৫-৬ ঘন্টা বিশ্রামের সুযোগ পায়। ফলে পরবর্তীতে এগুলো আরও শক্তি নিয়ে মানবদেহে কাজ করতে পারে। এমনকি অনবরত খাদ্যগ্রহণে মানবদেহের পেটে এক ধরনের বিষাক্ত বর্জ্য-পদার্থের সৃষ্টি হয়, যা পানাহার বা রোযা ব্যতীত পরিহার সম্ভব নয়।

আজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এ-দাবি খুবই যুক্তিযুক্ত, মানবদেহের যকৃতের অবসর গ্রহণের সময়কাল বছরে কমপক্ষে এক মাস হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর যেহেতু উপবাস ব্যতীত যকৃতের অবসর সম্ভব নয়, তাই পুরো এক মাস রোযাই এর সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম। রক্তের বিশুদ্ধতা অর্জনে ও রক্তনালীতে চর্বি জমানো থেকে বিরত রাখতে রোযার ভূমিকা অপরিহার্য।

রোযার ও অজুর যৌথ প্রতিক্রিয়ায় যে শক্তিশালী সমন্বয় সাধিত হয়, তার মাধ্যমে মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহের এক অতুলনীয় ভারসাম্য সৃষ্টি হয়, যা সুস্থ্য থাকার পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও রোযা দেহের অণুকোষ ও প্রজনন অঙ্গগুলোয় নব জীবনীশক্তি প্রবাহিত করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন– 'তোমরা যদি অনুধাবন কর, তাহলে তোমাদের জন্য এটা উত্তম যে, তোমরা রোযা রাখবে।' (সূরা বাকারা-১৮৫)

তাই আসুন না, আমরা সবাই এই রমযানে রোযার সাধনা দ্বারা নিজেকে কবুলিয়তে দোয়ার মোকামে উপনীত করতে আপ্রাণ চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত করি। যে ক'টা দিন রমযান আসতে অবশিষ্ট আছে আমরা একটি রুটিন তৈরী করতে পারি, যার ফলে আমাদের ইবাদতে সুবিধা হবে এবং অফিস-আদালত বা ব্যবসা-বাণিজ্যেও কোন সমস্যা হবে না। আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন আমাদের সবাইকে সুস্থ্যতার সাথে রমযানের পবিত্র দিনগুলো বিশেষ ইবাদত-বন্দেগীর মাধ্যমে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

masumon83@yahoo.com

আসন্ন রমযান মাসে ওয়াক্‌ফে জাদীদের ২০১৬ সনের চাঁদা আদায় প্রসঙ্গে

আপনারা অবগত আছেন যে, হুযূর (আই.) সকল আহমদীকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন এবং হুযূর (আই.) এর দপ্তর থেকে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও তাগিদ করেছেন, চাঁদার ওয়াদা যাতে পূর্বের চেয়ে বেশী হয় এবং প্রত্যেক জামা'তের অংশগ্রহণকারী সদস্য সংখ্যা নওমোবাইনসহ ১০০% পূর্ণ হয় সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। আপনাদের নিকট বিনীত নিবেদেন, আসন্ন রমযান মাসে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের আশারা পালনের মাধ্যমে ১০০% ওয়াক্‌ফে জাদীদ চাঁদা আদায়ের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে এবং উক্ত চাঁদা আদায়কৃত রিপোর্ট আগামী রমযানের মধ্যে ন্যাশনাল আমীর এর দপ্তরে পাঠাতে হবে। কেননা প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরেও ওয়াক্‌ফে জাদীদ চাঁদার পরিশোধিত নামের তালিকা হুযূর আকদাস (আই.) এর দপ্তরে দোয়ার জন্য প্রেরণ করা হবে।

তাই আমাদের প্রত্যেকের এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে যেন আমরা আমাদের প্রাণ-প্রিয় হুযূরের দোয়ার বরকতের অংশীদার হতে পারি।

শহীদুল ইসলাম বাবুল, সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ
মোবাইল: ০১৭১৪-০৮৫০৭০/০১৭৩০০২৮৫৭৬

প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় মহানবী (সা.) যে দোয়া করতেন

বাতাস যখন ভয়াবহ রূপ ধারণ করতো তখন মহানবী (সা.)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেতো। এমন মুহূর্তে মহানবী (সা.) বাতাসের ক্ষতি থেকে মহান আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন, দোয়ায় রত থাকতেন, আল্লাহ যেন এর ক্ষতি থেকে উম্মতকে রক্ষা করেন। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে– হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'কখনো ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ (সা.) দু'হাটু পেতে বসে যেতেন এবং বলতেন, হে আল্লাহ! একে করুণাস্বরূপ করো, শাস্তিস্বরূপ করো না। হে আল্লাহ! একে মৃদু বাতাসে পরিণত করো, ঝড় তুফানে পরিণত করো না। (মিশকাত)।

এছাড়া মহানবী (সা.) এই দোয়াও করতেন– **'আল্লাহুম্মা লা তাকতুলনা বিগাযাবিকা ওয়ালা তুহলিকনা বিআ'যাবিকা ওয়া আফিনা কাবলা যালিকা'**। অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার ক্রোধ দ্বারা হত্যা কর না। আর তোমার আযাব দিয়ে ধ্বংস কর না বরং এর পূর্বে তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর।

কলমের জিহাদ

আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হলো-
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'
- ইমাম মাহদী (আ.)

"ধর্মে কোন জোর-জবরদস্তি নাই"
- আল কুরআন

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিত সংখ্যার পর-৫১)

প্রতিশ্রুত মসীহ এর আবির্ভাবের স্থান সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী (Place of his Coming)

প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাবের স্থান সম্পর্কে সাধারনভাবে নীতি-নির্ধারণ মূলক ভবিষ্যদ্বাণী নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে ধারনা করা যেতে পারে।

(ক) মথি ২৪ঃ২৭ "কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্বদিক হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিক পর্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্যপুত্রের আগমন হইবে।"

মিলিনিয়ম গবেষকগন উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে সরাসরিভাবে ব্যাখ্যা করত: উল্লেখ করেছেন যে, (১) যীশুর পুনরাগমন হবে বিদ্যুৎ চমকানোর মত যা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে উদ্ভাসিত হবে এবং (২) যেহেতু এই ভবিষ্যদ্বাণী যীশু করেছিলেন জেরু-যালেমে অবস্থান-কালে , তাই তার পুনরাগমন হবে যেরুজালেমের পূর্ব দিগন্ত থেকে এবং (৩) বিদ্যুতের আলোক-উদ্ভাসন দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাষায় প্রতিশ্রুত মসীহের শিক্ষার আলোকের প্রতি ইঙ্গিত বহন করছে।

(খ) যিহিস্কেল ৪৩ঃ২ "পরে তিনি আমাকে পূর্ব্বাভিমুখ দ্বারের নিকটে আনিলেন; আর দেখ, পূর্ব্বদিক হইতে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের প্রতাপ আসিল; তাঁহার শব্দ জলরাশির শব্দের ন্যায়, এবং তাঁহার প্রতাপে পৃথিবী দীপ্তিময় হইল।" (যিহিস্কেল পুস্তকটি তৌরাতের অন্তর্ভূক্ত অংশ)

উপরোক্ত বর্ননা দ্বারা পূর্ব-দিক থেকে যীশুর আবির্ভাবের বিষয়টি আরো সত্যরূপে প্রমানিত হয়েছে।

(গ) প্রকাশিত বাক্য: ৭ঃ২ "পরে দেখিলাম, আর এক দূত সূর্যের উদয়-স্থল হইতে উঠিয়া আসিতেছেন, তাঁহার কাছে জীবন্ত ঈশ্বরের মুদ্রা আছে।"

লক্ষ্যনীয় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত মসীহের আবির্ভাব-স্থান হিসেবে সূর্য-উদয়ের স্থান তথা পূর্ব-দিগন্তের কথাই বলা হয়েছে। জীবন্ত ঈশ্বরের মুদ্রা দ্বারা আগমনকারীর উপর ঈশ্বর কর্তৃক অর্পিত সত্য-প্রচারের সুমহান দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করছে।

প্রতিশ্রুত মসীহের পুনরাগমন সম্পর্কিত বাইবেলের উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে অন্যান্য ধর্ম-গ্রন্থে বর্ণিত প্রতিশ্রুতির অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনের সুরা জুমআর "ওয়া আখারিনা মিনহুম" সংযুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-স্বয়ং বলেছেন যে তাঁর বুরুজী আগমনের মাধ্যমে তিনি পারশ্য বংশীয় হবেন (বুখারী শরীফের বরাতে)। এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সেই আগমনকারী পারশ্য তথা পূর্বাঞ্চলের হবেন। আর একটি হাদীসে আছে যে, ইমাম মাহদীর খিলাফত পূর্বদেশে কায়েম হবে (ইবনে মাজার বরাতে) আর একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত মসীহ দামেস্কের পূর্বদিকে শুভ্র মিনারের নিকট দুই ফেরেস্তার কাঁধের উপর হাত রেখে আবতরণ করবেন (সহীহ মুসলিম ও মেশকাত)।

বস্তুত:পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পর্যালোচনা করলে একথা সুস্পষ্ট সত্য-রূপে প্রমাণিত হয় যে, আহমদীয়া সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা প্রতিশ্রুত মসীহ রূপে আগমনকারী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-এর আবির্ভাব স্থানের সাক্ষ্য সত্যায়িত হয়েছে। তিনি ভারতবর্ষের কাদিয়ান নামক স্থান থেকে আবির্ভূত হয়েছেন। আর একথা অনস্বীকার্য যে, দামেস্কের ঠিক পূর্ব দিকে কাদিয়ান অবস্থিত।

শেষ-যুগে মনুষ্যপুত্র তথা প্রতিশ্রুত মসীহ-এর আবির্ভাবের চিহ্ন-স্বরূপ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারী ইত্যাদি বিপদাবলীর মারাত্মক বিস্তৃতি প্রসঙ্গে বাইবেলে বর্ণিত কতকগুলো ভবিষ্যদ্বাণীর পর্যালোচনাঃ

* "আর নোহের সময়ে যেরূপ হইয়াছিল, মনুষ্যপুত্রের সময়ও তদ্রুপ হইবে। ...সেইরূপ লোটের সময়ে যেমন হইয়াছিল...মনুষ্যপুত্র সেদিন প্রকাশিত হইবেন, সে দিনেও সেইরূপ হইবে।" (লুক, ১৭ঃ২৬,২৮,৩০)।

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে প্রতিশ্রুত মসীহ রূপে আগমনকারী আহমদীয়া আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতার আগমনের যুগে। কারণ নূহের যুগের মত মহা-প্লাবণ এবং অন্যান্য দুর্যোগ চতুর্দিকে এমন প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে পড়েছে যা তাঁর দাবীর সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ বলে সত্যায়িত হয়েছে।

* "মনুষ্যদের গাত্রে ব্যথা-জনক দুষ্টক্ষত জন্মিল।...সমুদ্রের জীবগণ মরিল।...প্রচণ্ড মহা ভূমিকম্প হইল।...আর আকাশ হইতে মনুষ্যদের উপরে বৃহৎ বৃহৎ শিলা বর্ষণ হইল।" (প্রকাশিত বাক্য, ১৬ঃ২,৩,১৮,২১)।

* "শেষ কালে এইরূপ হইবে, ইহা ঈশ্বর বলিতেছেন, ...আমি উপরে আকাশে নানা অদ্ভুত লক্ষণ এবং নীচে পৃথিবীতে নানা চিহ্ন, রক্ত, অগ্নি ও ধুম বাষ্প দেখাইব।" (প্রেরিত, ২ঃ১৭,১৯)

উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দিতে প্লেগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, এইডস, যৌন-নোংরামী ও নগ্নতা, সমকামিতা, লজ্জাহীনতা প্রভৃতি অভূতপূর্ব মহামারীরূপে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে। সেই

সঙ্গে ভূমিকম্প, শিলা–বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের এবং প্রলয়ংকরী যুদ্ধের ভয়াবহতা ঐশী নিদর্শনরূপে প্রকাশিত হয়েই চলেছে।

* "তোমরা যুদ্ধের কথা ও যুদ্ধের জনরব শুনিবে, ...জাতির বিপক্ষে জাতি ও রাজ্যের বিপক্ষে রাজ্য উঠিবে, এবং স্থানে স্থানে দুর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প হইবে।...হায়, সেই সময়ে গর্ভবতী এবং স্তন্যদাত্রীদিগের সন্তাপ হইবে। ...কেননা তৎকালে এরূপ মহাক্লেশ উপস্থিত হইবে, যেরূপ জগতের আরম্ভ অবধি এ পর্যন্ত কখনও হয় নাই, কখনও হইবেও না।" (মথি, ২৪ঃ৬, ৭, ৮, ১৯, ২১)।

এই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা সম্পর্কে অন্যত্র আলোচিত হয়েছে (ত্রিত্ববাদী দাজ্জালী ফেতনা ও যুদ্ধ-মহাযুদ্ধ-বাজ ইয়াজুজ-মাজুজের সৃষ্ট ক্রমবর্ধমান বিশৃংখলা এবং ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড প্রসংঙ্গে)। প্রচন্ড মাত্রায় সংঘটিত যুদ্ধ–মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, মানুষের চরম দুর্ভোগ এবং মহাক্লেশ বর্তমান যুগকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছে। এই সকল বিষয় অবশ্যই একজন ঐশী–সতর্ককারীর দিকে ইঙ্গিত করছে।

* "কিন্তু ইহা জানিও শেষকালে বিষম সময় উপস্থিত হইবে। কেননা মনুষ্যেরা আত্মপ্রিয়, অর্থ প্রিয়, আত্মশ্লাঘী, অভিমানী, ধর্ম নিন্দুক, পিতামাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অসাধু, স্নেহ রহিত, ক্ষমাহীন, অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়, প্রচন্ড সদবিদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক; দুঃসাহসী, গর্বান্ধ, ঈশ্বর–প্রিয় নয় বরং বিলাস–প্রিয় হইবে।" (২ তিমথীয়, ৩ঃ১-৪)।

বস্তুবাদীতা, স্বার্থন্ধতা, বিশ্বাস–ঘাতকতা প্রভৃতি দোষ–ত্রুটিগুলো মানুষের মধ্যে আগেও ছিল–কিন্তু বর্তমান যুগে এগুলো অস্বাভাবিক মাত্রায় ব্যপকতা লাভ করেছে। ফলতঃ মানব–সমাজের এরূপ ভয়াবহ নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষা কল্পে ঐশী পরিকল্পনা অনুযায়ী অবশ্যই প্রতিশ্রুত সংস্কারক এবং সতর্ককারীর আবির্ভাব ঘটেছে। এ সম্বন্ধে আর একটি ভবিষ্যদ্বাণী হলোঃ "যে দণ্ড তোমরা মনে করিবেনা, সেই দণ্ডে মনুষ্য–পুত্র আসিবেন" (মথি ২৪ঃ৪৪ ও লুক, ১২ঃ৪০)।

ধ্বংস–লীলার ক্রমবর্ধমান পরিমাণ ও প্রচণ্ডতার প্রেক্ষিতে বিশ্ববাসীর প্রতি উদাত্ত সতর্কবাণীঃ

উল্লেখ্য যে, ভূমিকম্প মহামারী, যুদ্ধ–বিগ্রহ, দূর্ভিক্ষ ইত্যাদি দুঃখজনক ঘটনাগুলো ইতিপূর্বেও সংঘটিত হয়েছে। সুতরাং প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, এই ধরনের ঘটনাগুলো কোন দাবিকারকের দাবির সত্যতার সাক্ষ্য–প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করার মধ্যে কোন বিশেষত্ব আছে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেনঃ "কিন্তু যে দেশের জন্য আমি দৃষ্টান্তস্বরূপ প্লেগের সংবাদ দিয়েছি এবং ভয়ংঙ্কর ভূমিকম্প সম্পর্কে অবহিত করেছি উহা এই দেশের অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রকৃতপক্ষে আযীমুশ্বান ভবিষ্যদ্বাণী। কেননা, এই প্রেক্ষিতে যদি দেশের শত বছরের ইতিহাসে দেখা যায় তবুও প্রমাণিত হয় না যে, এই দেশে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে–এরূপ ভয়াবহ প্লেগ তো অনেক দূরের কথা। অল্প সময়ের মধ্যেই লক্ষ লোককে এই প্লেগ বিনাশ করে দিয়েছে। ...এই কথা কি কেউ প্রমাণ করতে পারে যে, ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী যে ভয়ংঙ্কর ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়েছে তদ্রুপ ধ্বংসলীলা পূর্বে এই দেশে সংঘটিত হয়েছিল?

"ভূমিকম্প সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণীতে একথা বলা ছিল যে, দেশের একটি অংশ ইহা দ্বারা ধ্বংস হয়ে যাবে– যেমন কাংড়া, ভাগচু সদৃঢ় ও জলামুখী এই ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়েছিল। দুই হাজার বছরের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ ইংরেজ গবেষকগণ এই সাক্ষ্যই দিয়েছেন। অতএব এমতাবস্থায় আমার সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করা একটি তাড়াহুড়ার কাজ মাত্র।"

"আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে আযাব বা ঐশী শাস্তি সম্পর্কে নীতি–নির্ধারণী সতর্কবানী প্রদান করতঃ ঘোষণা করেছেনঃ আমরা কোন (জাতিকে) কখনো আযাব দেই না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা রসূল পাঠাই (বনী ইস্রায়েলঃ ১৬)। ...আল্লাহর আদি বিধান অনুযায়ী দুষ্ট লোকদিগকে কোন রসূলের আগমনের সময় বিনাশ করে দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতিত আমি বারাহীনে আহমদীয়া নামক গ্রন্থে এবং আমার লিখিত অনেক পুস্তকে এই সংবাদ দিয়েছিলাম যে আমার যুগে পৃথিবীতে অনেক অসাধারণ ভূমিকম্প আসবে এবং অন্যান্য বিপদও আসবে এবং তার ফলে পৃথিবীর বিরাট অংশ বিনাশ–প্রাপ্ত হয়ে যাবে। **অতএব এতে কি সন্দেহ আছে যে আমার ভবিষ্যদ্বাণীর পর পৃথিবীতে ভূমিকম্প ও অন্যান্য বিপদাবলীর আগমন–ধারা শুরু হয়ে যাওয়া আমার সত্যতার জন্য একটি নিদর্শন?"**

"অতএব স্মরণ রাখতে হবে যে, যখন খোদার কোন রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়–ঐ মিথ্যা প্রতিপন্ন কোন বিশেষ জাতি বা পৃথিবীর কোন বিশেষ অংশের লোকেরা করুণ না কেন –তখন খোদাতালার আত্মাভিমান সাধারণ শাস্তি অবতরণ করে এবং আকাশ হতে বিপদাবলী অবতীর্ণ হয়। অধিকাংশ সময় এরূপ হয় যে, প্রকৃত অপরাধী যে ফ্যাসাদের গোড়া তাকে পরবর্তীতে পাকড়াও করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফেরাউনের সামনে হযরত মুসা (আ.) কিছু ভয়ংঙ্কর নিদর্শন দেখিয়েছিলেন। প্রথমদিকে ফেরাউনের নিজের কোন ক্ষতি হয় নাই এবং গরীবরাই মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু অবশেষে খোদা ফেরাউনকে তার বাহিনীসহ ডুবাইয়া ছিলেন। ইহা আল্লাহ্‌র বিধান যা কোন ওয়াকেবহাল ব্যক্তি অস্বীকার করতে পারে না।" (বিস্তারিত জানার জন্য 'হাকীকাতুল ওহী' এবং অন্যান্য পুস্তক দ্রষ্টব্য)।

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো হতে একথা সুস্পষ্ট যে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীতে ভূমিকম্প ও অন্যান্য বিপদাবলীর আগমন–ধারা শুরু হয়ে যাওয়া–এমন একটি বিষয় যা বর্তমান যুগের প্রেক্ষাপটে এতবেশী সুস্পষ্ট যে অধিকতর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নাই। যেমন যুদ্ধ ও মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত আধুনিক মারনাস্ত্র, পরমানু বোমার ব্যবহার, মহাপ্লাবন, সুনামী ও ভূমিকম্পের মারাত্মক ক্ষয়–ক্ষতি, এইডস এবং নেশা–জাতীয় মাদকাশক্তির ব্যাপকতা,ইয়াজুজ–মাজুজ ও দাজ্জালী ফেতনা–ফ্যাসাদের তীব্রতা, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ন্যায়–নীতি ও সুবিচারহীন সমাজ–ব্যবস্থা, দূর্নীতি ও দুঃশাসন এবং অন্যায়–অত্যাচার–নিপীড়নের যাঁতাকলে নিরীহ মানুষের চরম দুরাবস্থা, সন্ত্রাস–জঙ্গীবাদ দ্বারা তথাকথিত অস্ত্রের জিহাদের নামে নরহত্যার তান্ডব–লীলা (যা পৃথিবীর কোন সত্য ধর্মের শিক্ষা দ্বারা সমর্থিত নয়) ইত্যাদি বিষয়গুলো পরিমান ও প্রচন্ডতার মাত্রায় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ঐশী–নির্দেশিত পথ ও পন্থায় এ সমস্যাগুলোর সুষ্ঠ সমাধান কল্পে প্রতিশ্রুত সতর্ককারীকে সনাক্ত করা অত্যাবশ্যক। শান্তির রাজপুত্রকে (Prince of Peace) চিনতে হবে। তাহলে পৃথিবীতে স্বর্গ–রাজ্য Kingdom of Heaven on Earth (রূপকার্থে) অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। সত্য দ্বারাই সত্যের মহাবিজয় হবে এবং মিথ্যা অবশ্যই দূরীভূত হবে।

(চলবে)

খিলাফত দিবস ও ঐশী খিলাফতের কল্যাণ

মৌ. মোজাফফর আহমদ রাজু

বর্ষ পঞ্জিকায় যখনই "মে" মাস আসে জামা'তে আহমদীয়া তখন ২৭ মে খিলাফত দিবসের স্মরণ করে। আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ রূপে দাবি করেন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। এই দাবি ছিল ১৩ শত হিজরী সনের পরে। দাবির পরে হাজার হাজার ওহী ইলহামের সংবাদ তিনি দুনিয়াতে পৌঁছে দেন যার পূর্ণতা সেই সময় থেকে আজ অবধী বিশ্ববাসী অবলোকন করে আসছে। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তিনি (আ.) ১৯০৫ সালে উপর্যুপরি ওহী লাভ করতে থাকেন দ্বিতীয় কুদরতের অর্থাৎ খিলাফতের ব্যবস্থা কায়েমের জন্য।

পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ৫৬ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মু'মিনগণকে অমোঘ এক বাণী দিয়েছেন বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন– অর্থাৎ "তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদের খলীফা বানাবেন যেভাবে তিনি পূর্ববর্তীদের খলীফা বানিয়েছিলেন। মহানবী এর হাদীসে নুমান বিন বশির (রা.) এর বর্ণনায় এবং আহমদ বায়হাকী হাদীসের গ্রন্থে খিলাফত সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করা আছে যে, নবুওয়াতের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৯০৮ সালের ২৬ মে তারিখে হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) আল্লাহ্ তা'লার ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান। অতঃপর এর পরের দিন আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মৌলভী আলহাজ্জ হেকিম নূরুদ্দীন (রা.) কে খলীফা নিযুক্ত করেন এবং ইসলামী শিক্ষা অনুযায়ী আহমদী সদস্যগণ তাঁর হাতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) এর নামে বয়আত গ্রহণ করেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী বিশ্বনবী রাহমাতুল্লিল আলামিন (সা.) এর তিরোধানের পরে, প্রথমে সাহাবীগণ হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হন এবং পর্যায়ক্রমে হযরত আলী (রা.) পর্যন্ত ঐশী ব্যবস্থাপনার অধীনে বয়আত নিতে থাকেন মহানবী (সা.) এর নামে। নবী যেমন তাঁর জামাতকে একতাবদ্ধ করে রাখেন ও উত্তর উত্তর উন্নতির চূড়ায় নিয়ে যান তেমনি নবীর তিরোধানের পরে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নির্বাচিত খলীফাও তাঁর জামাতকে একই ভাবে উন্নতির পথে নিয়ে যান। নবী যাদেরকে সরাসরি বয়আত নেন তাদেকে তিনি ঐশী শক্তির বলে 'তা' দিতে থাকেন, তিনি যখন আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান তখন নবীর কার্যক্রমকে প্রবাহমান রাখার জন্য আল্লাহ্‌র ইচ্ছার বাস্তবায়ন করেন আর তাকে বলা হয় খলীফা।

ঐশী জামা'তের মূল শক্তি খিলাফত। খিলাফতের ওপর আল্লাহ্‌র হাত থাকে। তিনি তাঁর মনোনীত খিলাফত ব্যবস্থাকে হেফাজত করেন। মাত্র ত্রিশ বছরের মধ্যে যখন খিলাফতে রাশেদা নষ্ট হয়ে যায়, এরপর মুসলিম জাহানে অনেকেই অনেকবার খিলাফত কায়েমের ব্যবস্থা করেছে কিন্তু তাতে সফলতার মুখ দেখা যায় নি। খিলাফত নবুওয়াতের দরজা দিয়ে জমিনে প্রবেশ করে আর খিলাফত কায়েম করা বা খলীফা বানানো কোন জাতি বা মানবের কাজ নয়, এটি সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র কাজ। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতাকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে বা হয়েছিল তা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যবস্থা ১৯০৮ সালের ২৭ মে তারিখে জারি করা হয়। যখন হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) দুনিয়া থেকে চলে যান তখন বিরোধী শক্তি মনে করেছিল যে, এই বুঝি মির্যা সাহেবের জামা'ত শেষ হয়ে গেল। হযরত মৌলভী হেকীম নূরুদ্দীন (রা.) এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে দুনিয়াবাসী ও বিরোধী শক্তিকে আরও একবার নিরাশ করে জামা'তের উন্নতির ধারাবাহিকতা জারি হল।

মে-মাস আমাদের ভাবিয়ে তুলে গত দিনগুলো কিভাবে পার করেছি! খিলাফত ও খলীফার আদেশ বা নসিহতকে কিভাবে বাস্তবায়ন করেছি। পবিত্র কুরআনের সূরা আনফালে আছে– "হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দাও যখন সে তোমাদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানায়।" আল্লাহ্‌র খলীফা জীবনদানকারী শক্তি, শান্তির সোপান, হেফাজতের আশ্রয় স্থল, জ্ঞানের কান্ডারী, প্রতি শুক্রবার মুসলিম বিশ্বের জন্য জুমুআর খুতবা প্রদান করেন। খুতবার শুরু হতে শেষ অবধি প্রতিটি মানুষের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা পত্র থাকে, জ্ঞানের ভান্ডার থাকে, পারিবারিক জীবন কেমন হওয়া চাই, সে কথা থাকে, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনের শত কথা ও দিকনির্দেশনা থাকে, আল্লাহ্‌র পথে তাঁর (সা.) শিক্ষা অনুযায়ী চলার জন্য আদর্শিক পথের সন্ধান দেওয়া হয়ে থাকে।

খলীফায়ে ওয়াক্ত প্রতিটি মহূর্তে, আল্লাহ্‌র সবচেয়ে প্রিয় মানুষ মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবন ব্যবস্থার দিক-নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এক আহমদী মুসলমান খলীফার ডাকে সারা দিয়ে মহানবী (সা.) এর সিরাতকে অনুসরণ করলেই সে একজন আদর্শ পিতা হবে, আদর্শ স্বামী হবে, আদর্শ ভাই হবে, আদর্শ বোন হবে, আদর্শ মাতা হবে, আদর্শ প্রতিবেশী হবে, আদর্শ ব্যবসায়ী হবে, আদর্শবান সহকর্মী হবে, মোটকথা সার্বিক ক্ষেত্রে যখন মহানবী (সা.) এর আদর্শিক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা হবে তখন আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় একটি সুন্দর সমাজ, সুন্দর দেশ জাতি গঠন হবে। অতঃপর সারা বিশ্বে ও শান্তির একটি বাড়ি তৈরী হবে।

আহমদীয়া জামা'তের ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) সেই পথের দিকে আহ্বান করে চলেছেন। আল্লাহ্ করুন, সারা পৃথিবীতে যেন আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। (আমীন)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল

(১৩তম কিস্তি)

১৯৬৮

১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ তারিখ ৪৮তম প্রাদেশিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এ জলসায় রাবওয়া থেকে শুভাগমন করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার এবং কাজী মোহাম্মদ নাজির সাহেব। তখন পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি ছিল নিম্নরূপ ঃ আগামী ১৬, ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮ তারিখ ৪৮তম প্রাদেশিক সালানা জলসা ৪নং বকশীবাজার রোড, ঢাকা-১ এ অনুষ্ঠিত হবে। দেশ বিদেশের প্রখ্যাত বাগ্‌চী ও চিন্তাবিদগণ এই জলসায় যোগদান করবেন এবং ইসলামের বিভিন্ন দিক ও বর্তমান বিশ্বে এর প্রচার সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করবেন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্বসাধারণের উপস্থিতির আহ্বান জানানো যাচ্ছে। (পাক্ষিক আহমদ ১৫-৩১ জানুয়ারি ১৯৬৮)।

এ জলসায় ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ তারিখ প্রাদেশিক আমীর সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। এতে তিনি বলেন, গত জলসা থেকে আবার একটা বছর ঘুরে গেলো। এই বছর জগতের এবং আমাদের জামাতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ বলে লেখা থাকবে।

গত জুন মাসে ইসরাইলের আলেমানা হামলায় আরব রাষ্ট্রসমূহের বিপদ এবং বায়তুল মুকাদ্দাসের হস্তচ্যুতি মুসলমান জাতির জন্য এক মহা দুঃখময় ঘটনা। লজ্জায় এবং ক্ষোভে যখন সারা মুসলমান জাতি মুহ্যমান, তখন আল্লাহ্ তা'লার অপার অনুগ্রহে ঐ ঘটনায় এক মাসের মধ্যেই আমাদের প্রিয় ইমাম হযরত মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.) ডেনমার্কের কোপেনহেগেন শহরে আহমদী মেয়েদের অকুণ্ঠ দানে নির্মিত "নুসরত জাহান" মসজিদের উদ্বোধন উপলক্ষে ইউরোপে গমন এবং সেখানে বিভিন্ন শহরে ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকার বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র যোগে পাশ্চাত্য ও মধ্যপ্রাচ্য স্বতঃস্ফূর্ত প্রচার এবং ২৮ জুলাই তারিখে লন্ডন শহরের ওয়ান্ডার্সওয়ার্থ হলে তাঁর এক ইতিহাস সৃষ্টিকারী বক্তৃতা ইসলামের ওপর আপতিত কালো মেঘের কোলে সোনালী আলো একে দিল। তাঁর বক্তৃতার বিষয় ছিল এক শান্তিবাণী ও এক হুশিয়ারী। উক্ত বক্তৃতায় তিনি জগতবাসীকে, বিশেষ করে পাশ্চাত্য জাতিগুলিকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দিয়ে সাবধান করে দিয়েছেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণ না করলে ২৫/৩০ বছরের মধ্যে ভীতিপ্রদ ধ্বংসের মুখ দেখবে। আল্লাহ্ তা'লার আসন্ন আযাব হতে বাঁচবার একমাত্র উপায়, সময় থাকতে ইসলাম গ্রহণ করে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে স্থান লাভ করা। এ ছাড়া বাঁচবার দ্বিতীয় পথ ও পন্থা নাই। এই ভবিষ্যদ্বাণী বাইবেল, পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণীর ভিত্তিতে সুদৃঢ় ভাব প্রতিষ্ঠিত।

আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র মানবজাতিকে একমন্ডলিভুক্ত দেখতে চান। সৃষ্টির লক্ষ্য এটাই। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তিনি হযরত মোহাম্মদ (সা.)-কে দিয়ে বিশ্ব মানবতার শিক্ষা গ্রন্থ পবিত্র কুরআন পাঠিয়েছেন। হযরত মোহাম্মদ (সা.)-এর অনুগমণে পবিত্র কুরআনের অনুশীলনেই সেই লক্ষ্য অর্জিত হবে। যে জন্য প্রযোজন পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সারা বিশ্বে কার্যকরী আদর্শের দ্বারা প্রচার করা। এ কাজ মুসলমানদের। প্রথম যুগে সাহাবা কেরাম (রা.) এবং কিছুকাল যাবৎ তাঁদের পরবর্তীগণ এ সম্বন্ধে তাঁদের কর্তব্য যথাবিহিত ভাবে সম্পাদন করে গেছেন।

বিশ্ব আজ অন্যায়, অত্যাচার, পাপাচার ও ব্যভিচারে ভরে গেছে। মানুষের লোভ, লালসা ও হিংসা প্রবল হয়ে জগতকে আশু ধ্বংসের দিকে ধেয়ে নিয়ে চলছে। মানব জাতির প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আজ ব্যধিগ্রস্ত। এর প্রতিকার একমাত্র কুরআন করীমে আছে। এতে মানব জাতির সকল রোগ নিরাময়ের সুব্যবস্থা আছে। সুতরাং আজ মানবতাকে রক্ষা করতে হলে মানব জাতিকে পবিত্র কুরআনের দিকে মনোযোগী হতে হবে।

আমাদের প্রিয় ইমাম সেইজন্য আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার দিকে অবিরাম আহ্বান জানাচ্ছেন। আমাদেরকে পবিত্র কুরআন শিখে, পবিত্র কুরআনের আলোকে আলোকিত হয়ে, জগতবাসীকে ইসলাম শিখাতে হবে। তাই তিনি আদেশ দিয়েছেন, জামাতের প্রতিটি আহমদী আবাল বৃদ্ধ বনিতা যেন তিন বছরের মধ্যে কুরআন শিখে ফেলেন।

পবিত্র কুরআন শিক্ষার জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের। একাজ প্রত্যেক পিতা-মাতা ও অভিভাবকের ওপর ন্যস্ত। যেখানে তারা অক্ষম সেখানে জামাতের নিযামের দ্বারা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য স্থানীয় আঞ্জুমান, খোদ্দাম, আনসার ও লাজনাকে এক যোগে প্রোগ্রাম করে কাজ করে যেতে হবে।

নিজেদের আখলাককে সংশোধন করার জন্য হযরত আকদাস আমাদেরকে পাশ্চাত্যের অনুকরণ ও কদাচার ত্যাগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। পর্দা করা এবং ছেলেমেয়েদেরকে কলেজে সহশিক্ষা বন্ধ করার আদেশ দিয়েছেন। বে-পর্দা চলা ও সহশিক্ষা সমাজে ব্যাভিচার আনার জন্য রাজপথ বিশেষ। যাদের স্কন্ধে দুনিয়া হতে ব্যাভিচার দূর করার দায়িত্ব তাদেরকে এই দুই মন্দ প্রথাকে শক্ত হস্তে দূরে ঠেলে ফেলে দিতে হবে। হযরত আকদাস (আই.) বলেছেন, আগামী ২৫/৩০ বছরের মধ্যে জগতে এক বিরাট ধ্বংসলীলা সাধিত হবে এবং নূতন তথা ইসলামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে । ঘর যখন জীর্ণ হয়ে যায়, তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সময় থাকতে নিজ হাতে তাকে ভেঙ্গে ফেলে। যে তা না করে সে অচিরেই পরিবার পরিজন সহ ঘর চাপা পড়ে মরে। যাঁর চোখে আকাশের আলো এসে লেগেছে তিনি আমাদেরকে সেই মহা দৈব বিপদের সংবাদ দিয়েছেন। আমরা তাঁকে চিনেছি, জেনেছি এবং মেনেছি। তিনি প্রত্যেক আহমদীর গৃহদ্বারে দাঁড়িয়ে পাশ্চাত্যের অনুকরণ এবং সকল প্রকার কদাচার পরিহার করতে আদেশ করেছেন। সুতরাং ভ্রাতাগণ এদিকে অবহিত হোন এবং সকল অকল্যাণের পথকে বর্জন করে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে শিরোধার্য করুন। এর জন্য সমবেত জোরদার প্রচেষ্টা চালিয়ে নূতন সভ্যতা সৃষ্টির জন্য আগে হতে প্রস্তুত হোন। জড়বাদী কুশিক্ষা ধ্বসে যাবে, খসে যাবে, লোপ পেয়ে যাবে। যারা

কুশিক্ষার মায়াযুগের পিছনে ছুটবে তাদের একই পরিণাম হবে। (পাক্ষিক আহমদী ১৫-২৯ ফেব্রুয়ারি-১৯৬৮)।

জলসা সমাপ্তির পর প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রাদেশিক সালানা জলসা

বিগত ১৬, ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ সাল, শুক্র, শনি ও রবিবার তিনদিন ব্যাপী প্রাদেশিক ৪৮তম সালানা জলসা ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশের সকল জামা'ত হতে বিপুল সংখ্যক আহমদীসহ বহু গয়ের আহমদী এই জলসায় যোগদান করেন।

প্রাদেশিক আমীর মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে প্রথম দিনের অধিবেশন শুরু হয়। জলসা কমিটির চেয়ারম্যান মৌলভী শামসুর রহমান (বার-এট-ল) সাহেব সকল আগন্তুকের উদ্দেশ্যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর প্রাদেশিক আমীর মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত অধিবেশনে সদর মুরব্বী মওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের কৃষি ও তথ্য প্রধান মৌলভী মোহাম্মদ মোস্তফা আলী সাহেব, ইসলাহ ও ইরশাদের নাজের মোহতরম কাজী মোহাম্মদ নাজির সাহেব যথাক্রমে বর্তমান বিশ্বে আহমদীয়া জামাতের অবদান, হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জীবন ও শিক্ষা, হযরত ঈসা (আ.)-এর ঊর্ধগমন প্রভৃতি বিষয়ে তথ্যপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

দ্বিতীয় দিনের প্রথম ভাগে মহিলাদের জন্য পৃথক অধিবেশন হয়। মোহতরম কাজী মোহাম্মদ নাজির সাহেব আহমদী মহিলাদের কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। মৌলভী আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এর তরজমা পেশ করেন।

পরবর্তী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জলসা কমিটির চেয়ারম্যান মৌলভী শামসুর রহমান বার-এট-ল সাহেব। উক্ত অধিবেশনে সদর মুরুব্বী মাওলানা আব্দুল আজীজ সাদেক সাহেব, মাওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব, মোহতরম মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব, মোহতরম কাজী মোহাম্মদ নাজির সাহেব যথাক্রমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর মোকাম, ইয়াজুজ মাজুজ ও দাজ্জাল, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ, হযরত রসূল করীম (সা.)-এর আশেকে মসীহ্ মওউদ (আ.) বিষয়ে গভীর আলোকপাত করেন।

তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম সাহেবযাদা শেখ জাফর আহমদ সাহেব। এই অধিবেশনে আনসারুল্লাহ্‌র কর্তব্য, খোদ্দামুল আহমদীয়ার কর্তব্য, বর্তমান বিশ্বে ধর্মের প্রয়োজনিয়তা, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.) এর ধর্মীয় হেদায়াত, ওয়াকফে জাদীদ ও তাহরীকে জাদীদের বৈশিষ্ট্য, ওয়াকফে জিন্দেগীর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন যথাক্রমে আনসারুল্লাহ্‌র যয়ীম মৌলভী মকবুল আহমদ সাহেব, প্রফেসর মৌলভী আবুল খালেদ সাহেব, মোহতরম শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব, সদর মুরুব্বী মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব এবং মওলানা সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব।

পরবর্তী অধিবেশনে ঢাকার আমীর মোহতরম মৌলভী শেখ মাহমুদুল হাসান সাহেব সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে খেলাফত, বহির্দেশে ইসলাম প্রচার, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আই.)-এর তাহরীক, ইউরোপ ভূখন্ডে তাঁর ঐতিহাসিক সফর, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাষণ দেন যথাক্রমে এডভোকেট মৌলভী বদরুদ্দীন আহমদ সাহেব, মৌলভী আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব, মোহতরম কাজী মোহাম্মদ নাজির আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব এবং মৌলভী শামসুর রহমান বার-এট-ল সাহেব।

সমাপ্তি ভাষণে সভাপতি সকলের প্রতি তাঁর আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। (পাক্ষিক আহমদী, ১৫-২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮)।

১৯৬৯-১৯৭০

১৯৬৯ সালে পূর্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সালানা জলসা অনিবার্যকারণবশত হয় নি। তখন শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে রাজনৈতিক অঙ্গণে উত্তাল তরঙ্গ বিরাজ করে। তবে পরবর্তী বছর ২৭-২৮ ফেব্রুয়ারী ও ১ মার্চ ১৯৭০ তারিখ ঢাকার দারুত তবলীগে অনুষ্ঠিত হয় ৪৯ তম সালানা জলসা। তখন এদেশের বিভিন্ন শহর ও গ্রামের আহমদীরা আন্দোলনের জোয়ারের মত বকশী বাজারে ছুটে আসেন। রাবওয়া থেকে দু'জন বুযূর্গের শুভাগমন হয়। সফল জলসা সমাপ্তির পর পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

প্রাদেশিক জলসা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ ও ২৮ ফেব্রুয়ারী এবং ১লা মার্চ রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে প্রাদেশিক আঞ্জুমানের ৪৯তম বার্ষিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। প্রদেশের বিভিন্ন জামাত হতে প্রায় এক হাজার আহমদী ভ্রাতা জলসায় যোগদান করেন। সদর হতেও দুইজন প্রতিনিধি জলসায় যোগদান করেন। তাঁরা হলেন, নাযের ইসলাহ্ ও ইরশাদ আল্লামা মোহাম্মদ নাজির লায়ালপুরী এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার। প্রাদেশিক আমীর মৌলভী মোহাম্মদ সাহেব সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার সাথে জলসার উদ্বোধন করেন।

জলসায় ইসলাম ও বিশ্ব শান্তি, ইসলাম ও বস্তুবাদ, হযরত রসূলে করীম (সা.) এর জীবনী, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সত্যতা, ওফাতে ঈসা (আ.) তাহাফুজে খতমে নবুওয়ত, বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার, পরকাল, জীবন্ত ধর্মের বরকত, হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ভালোবাসা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। জলসার সময় নিয়মিত তাহাজ্জুদ নামায অনুষ্ঠিত হয় এবং ফজরের নামাযের পর পবিত্র কুরআনের দরস অনুষ্ঠিত হয়।

আল্লাহ্ তা'লার ফজলে জলসায় মোট ৭ জন ভ্রাতা বয়আত করেন। বন্ধুগণ তাদের দৃঢ়তার জন্য দোয়া করবেন। (পাক্ষিক আহমদী ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ১৫ মার্চ ১৯৭০)।

(চলবে)

বিজ্ঞপ্তি

"পাক্ষিক আহমদী" পত্রিকার গ্রাহক চাঁদা যাদের বকেয়া রয়েছে তাদেরকে অতিসত্ত্বর পরিশোধ করার আহ্বান করা হচ্ছে। এছাড়া গ্রাহক সংক্রান্ত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন–

ফারুক আহমদ বুলবুল
মোবাইল : ০১৯১২ ৭২৪৭৬৯

কৃতী ছাত্র

মোহাম্মদ আবরার আনাম শান্ত, পিতা ফেরদৌস আহমদ, মাতা সেলিনা খাতুন, গ্রাম–পোঃ রমজান বেগ, থানা+জেলা মুন্সিগঞ্জ ২০১৫ইং সনের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় টেলেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করেছে, আলহামদুলিল্লাহ্। তার দ্বীন ও দুনিয়াবী উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য সকলের নিকট খাস দোয়া কামনা করছি।

ফেরদৌস আহমদ, মুন্সিগঞ্জ

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল
"বিশ্বের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে প্রকৃত মুসলমানের করণীয়।"
পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

বিশ্বে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে প্রকৃত মুসলমানের করণীয়

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে, "যাহারাল ফাসাদো ফিল্ বার্‌রে ওয়াল বাহ্‌রে" অর্থাৎ, "জলে-স্থলে পাপে (ফাসাদে) পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।" (সূরা আর রূম, ৩০ ঃ ৪২)

বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে পাওয়া যায়– "ধর্মীয় জ্ঞান উঠে যাবে, আধ্যাত্মিক অজ্ঞতা প্রসার লাভ করবে, মদের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে, পুণ্যকাজ কমে যাবে, ঝগড়া-বিবাদ বৃদ্ধি পাবে, মারামারি-কাটাকাটি বৃদ্ধি পাবে, ব্যবসায়ীদের মধ্যে ঈমানদারীর অভাব হবে, বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করে মানুষ গৌরব অনুভব করবে আর মিথ্যা সাক্ষ্য প্রচলন হবে ইত্যাদি।" এই সমস্ত লক্ষণ আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

আজকের এই পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাধী হচ্ছে শান্তির অনুপস্থিতি। সমকালীন বিশ্বে মানুষ বস্তুগত উন্নতির কারণে অনেক উচ্চস্তরে উঠতে পেরেছে। সন্দেহ নেই মানব সমাজের অধিকতর ভাগ্যবান অংশের লোকেরা প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের বাসিন্দা। যারা উন্নত-প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছে বেশী করে এবং তৃতীয় বিশ্ব বেশ খানিকটা উপকৃত হয়েছে। তথাপি মানুষের মধ্যে সন্তুষ্টি নেই। বরং অস্থিরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে ভীতি, শঙ্কা ও ভবিষ্যতের প্রতি অনাস্থা এবং সেই সঙ্গে অতীত থেকে প্রাপ্ত সকল উত্তরাধিকারের প্রতি গভীর অসন্তোষ। বিশেষ করে এটাই তরুণ-প্রজন্মের চিন্তাধারার গঠন প্রক্রিয়ার গভীরে। তাই মানুষ শান্তির অন্বেষায় ব্যাকুল।

অর্থাৎ– "জল আর জল সর্বত্র যেদিকে তাকাই কিন্তু পানীয় যে জল তা এক বিন্দুও নাই"– বর্তমান যুগের আধ্যাত্মিক অবস্থা এটাই। শান্তির ধর্ম হলো ইসলাম। শান্তি ক্ষুন্ন করে এমন কোনো কাজ ইসলাম অনুমোদন করে না। ইসলামের শিক্ষা মানুষের স্বার্থ এবং আশা-আকাঙ্খার প্রতিক্ষেত্রে শান্তির নিশ্চয়তা দান করে। যেমন (১) আন্তঃ ধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতি; (২) সামাজিক শান্তি; (৩) আর্থ-সামাজিক শান্তি; (৪) অর্থনৈতিক শান্তি; (৫) রাজনৈতিক শান্তি; (জাতীয় ও আন্তর্জাতিক) এবং (৬) ব্যক্তিগত শান্তি। যত রকম অশান্তির মূল কারণ হলো উপরোক্ত বিষয়াবলী। বিশ্বে অশান্তি ও নৈরাজ্যের পরিস্থিতির বিভিন্ন কারণ সমূহের মধ্যে আরো গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো–"অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা"। যেমন- কৃপণতা, সৎকাজে অর্থ ব্যয় না করা, এমনকি অন্যের সেবায় ও নিস্পৃহতা, সুদে টাকা আটানো, মদ্যপান ও জুয়া খেলা।

সারা বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ঐশী-নেতৃত্বের বিকল্প নেই। আজ সমগ্র বিশ্বে একক নেতৃত্ব না থাকার কারণে সর্বত্রই নৈরাজ্যকর অবস্থা। কেবলমাত্র আল্লাহ্‌র মনোনীত খলীফাই পারেন সারা বিশ্বকে শান্তি ও সুশৃঙ্খল করে তুলতে। একমাত্র "আহমদীয়া জামাতই" এক নেতাকে মান্য করে বলেই এদের মধ্যে কোন রকম নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা নেই। এজন্য বিশ্বে যাবতীয় নৈরাজ্যের পরিস্থিতিকে সামাল দেয়ার জন্য ঐশী-খলীফাকে মানা আবশ্যক। এবং অন্তত:পক্ষে বিশ্বের সকল মুসলিম জাহানের মুসলমানগণ যদি "ঐক্যবদ্ধ" হয় তাহলে সকল নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসান ঘটানো ইন্‌শাআল্লাহ্ সম্ভব হবে। সূরা বাকারার ১২-১৩ আয়াতে বর্ণিত আছে– "তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিও না। সতর্ক হও! প্রকৃত মুসলমানের দায়িত্ব হলো–সর্বপ্রকার ধর্ম বিরোধী বা গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা এবং এর প্রতিরোধ-ও করা। দোয়া ও ভালবাসার সাহায্যে মুসলমানগণ আর নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সমাপ্তি ঘটাতে পারে। "সর্বাঙ্গে ব্যথা ঔষধ দিবে কোথা?" সমাজের গাত্রে এমনি সর্বাঙ্গে ব্যাথা। আধ্যাত্মিক ঔষধ ব্যতীত আরোগ্য সম্ভব নয়।

সূরা কাসাসের ৭৮ নং আয়াতে আছে, "পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি হয় এমন কোনো কাজ করিও না। নিশ্চয় আল্লাহ্ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদিগকে ভালবাসেন না।" শান্তি ও মুক্তির দূত মহানবী (সা.) ঐক্য ও সম্প্রীতি ও সোহার্দপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দুনিয়ায় প্রেরিত হয়েছেন। নৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। আখেরী যামানায় ঠিক অনুরূপ পরিবর্তন হবে যখন বিশ্বনবী (সা.)-এর মহান প্রতিনিধি প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহ্‌দী (আ.) ধরাধামে আবির্ভূত হবেন। ফলে তাঁর নব উদ্ভাবনীতে প্রকৃতি মানবীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের ভিত্তিমূল কেঁপে ওঠার সঙ্গে সকল কিছুর আকৃতি-প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে মানুষের আদর্শ এক নবরূপ পরিগ্রহ করবে। বিদ্রোহ ও অকারণে হত্যাকান্ড ইসলামে নিন্দনীয়। কোনো মু'মিনের হত্যাকান্ড আল্লাহ্‌র কাছে সারা দুনিয়া ধ্বংসের চেয়েও বেশী মারাত্মক। দোয়া ব্যতিরেকে আজ পৃথিবীর ও মুসলিম জগতের ব্যাধী-নিরাময়ের অন্য কোন উপায় নেই। ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বে সকল মুসলমানই সমান অংশীদার। সকলেই এর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিশ্বমানব একটি পরিবার মাত্র। প্রকৃত মুসলমানের করণীয় হলো সকল ধরনের সন্ত্রাস, হানাহানি ও অকারণে হত্যাকান্ড থেকে দূরে থাকা। সকল ধরনের বিরোধের অবসান ঘটানোরই শিক্ষা দেয় ইসলাম। মানুষ হলো একটি 'বিন্দু-জগত' যা যাবতীয় সৃষ্টি থেকে প্রভাব গ্রহণ করেছে। এমনকি দূরবর্তী উর্ধ্বাকাশের তারকাপুঞ্জ তার-ও অংশগ্রহণ রয়েছে, "মানুষ" নামের এই বিন্দু জগতটিতে। মানুষ হয়ে উঠেছে বিশ্বজগতের "মনিব" এবং সে ভৃত্য কেবলমাত্র একজনেরই যে জন বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও প্রভু! সকল নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে প্রকৃত পথ হলো– মহানবী (সা.) এর অনুপম আদর্শ সর্বকালের সর্বাপেক্ষা অধিক কার্যকরী পন্থা। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে ইসলামের প্রকৃত অনুসারী করুন আর ইসলামের সকল নির্দেশাবলী মেনে চলার তৌফিক দান করুন, আমীন।

আনোয়ারা বেগম, রংপুর

খিলাফতকে আঁকড়ে ধরার মাধ্যমেই শান্তি নিহিত

কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "এবং এইভাবেই আমরা তোমাদিগকে এক উত্তম জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, যেন তোমরা সমগ্র মানবমন্ডলীর তত্ত্বাবধায়ক হও এবং এই রসূল তোমাদের তত্ত্বাবধায়ক হয় এবং যাহাদিগকে আল্লাহ্ হেদায়াত দিয়েছেন তাহারা ব্যতিরেকে অন্যদের জন্য ইহা কঠিন। এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ মানবমন্ডলীর প্রত অতি মমতাশীল, পরম দয়াময় (সূরা বাকারা ঃ ১৪৪)।

আল্লাহ্ তা'লা মহানবী বিশ্বনবী (সা.) এর মাধ্যমে ইসলামকে সমগ্র মানবজাতির জন্য ধর্মরূপে মনোনীত করেন, যার বিশ্বাস "লা শারীক" সাক্ষ্য দেয়া। হাজার বছরের অন্ধকার যুগকে ঘুচিয়ে দিয়ে এক আল্লাহ্‌র রাজত্ব কায়েম করে দিলেন মহানবী (সা.)। শির্‌ক, ত্রিত্ববাদকে সমূলে উৎপাটন করলেন, হাজারো দেব-দেবীর আস্তাকুরকে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত খানায় পরিণত করলেন। মানব জাতি পেলো শান্তির ধর্ম 'ইসলাম'। এক খোদা, এক নবী, পরবর্তীতে তাঁর এক খিলাফতের অধীনে থেকে সারা বিশ্ব শাসন করলো মুসলিম জাতি। তবে আজ সে রকম কোন নৈরাজ্য, অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দারিদ্রতা-ক্ষুধা কেন? যার করাল গ্রাসে জর্জরিত মুসলিম অধ্যুষিত জাতিগুলো। আজ প্রতিটি দেশে হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে জীবন দিতে হচ্ছে। "রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ায় প্রাণ হারায়" এই অবস্থা সর্বত্র। আজ সেই "আইয়ামে জাহেলিয়াত যুগকেও হার মানিয়ে দিয়েছে মানুষরূপী পশুরা। সবকিছুর জন্য কারণ একটিই– "পৃথিবীতে একজন সতর্ককারী এসেছে, আর পৃথিবী তাকে মেনে নেয় নি, কবুল করেনি'। এই ব্যক্তি হলেন, এই যুগের প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)। কখনো অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ হতো না, যদি পৃথিবীবাসী বিশেষ করে মুসলমানরা এই ঈমামকে মেনে নিতো। তাঁর খেলাফতের ছায়াতলে আসতো। মহানবী (সা.) বলেন, "এই উম্মত কিভাবে নষ্ট হতে পারে যার প্রথমে আমি ও শেষে আমার মাহ্‌দী"।

নৈরাজ্যের এই যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সবাইকে সেই দুনিয়ার কুকুর, সিংহ, ব্যাঘ্রদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য সকলকে বলেন, "প্রিয় বন্ধুগণ! শান্তির মত আর কিছুই নেই। চলুন আমরা এক হয়ে যাই ও এক জাতিতে পরিণত হই। আপনারা দেখছেন পরস্পরের প্রতি মিথ্যারোপ করার দরুণ কত বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে এবং দেশের কত ক্ষতি হয়েছে। আসুন, এখন এটাও পরীক্ষা করে দেখুন পরস্পরের সত্যতা স্বীকার করে নেয়ার মাঝে কত কল্যাণ নিহিত আছে। শান্তি স্থাপনের সবচেয়ে উত্তম উপায় এটিই। নতুবা অন্য কোন উপায়ে শান্তি স্থাপনে এমনটিই হবে, যেমন একটি ফোঁড়াকে পরিস্কার ও চকচকে দেখে এ অবস্থাতেই সেটাকে ছেড়ে দিয়ে তার বাহ্যিক চাকচিক্যে সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়া। অথচ এর ভিতর রয়েছে গলিত ও দুর্গন্ধযুক্ত পুঁজ"। (পয়গামে সুলেহ্)

আজ মুসলমানেরা ৭৩ ফেরকায় বিভক্ত। ফেরকায় ফেরকায় হানাহানি, মারামারি। ইসলাম তথা শান্তির ধর্মকে বিকৃত করছে তারা নিজেরাই। কারণ কেউ রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণীকে স্মরণ করে নি, তাঁর পুনঃআগমনকে দেখতে পায়নি। অন্ধের মত চোখ বন্ধ করে শান্তির পথ খুঁজছে তারা। তাদের উচিত ছিলো ইমাম মাহ্‌দীকে খুঁজে বের করা। অনেক অভাগা তাঁর সংবাদ পেয়েও তাঁর বিরোধিতা করছে যা পক্ষান্তরে আল্লাহ্‌র বিরোধিতার নামান্তর। তাঁরা নিজেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যারা কাদিয়ানের ইট-মাটি শেষ করতে চেয়েছিল তারা আজ কোথায়? আর কাদিয়ানের সেই ছোট্ট একটি আওয়াজ আজ সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে। আজ যদি কেউ নাও থাকে মান্য করার তবুও আল্লাহ্‌র অমোঘ বাণী পূর্ণতা পাবে "কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রুসূলী"। আল্লাহ্ এক জাতিকে সরিয়ে অন্য জাতিকে দায়িত্ব দিবেন শান্তির ধর্মকে আবারো প্রতিষ্ঠিত করতে। এটা আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি। বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের একটিই দায়িত্ব, আহমদীয়া খিলাফতকে আঁকড়ে ধরা। সেই সকল বিরুদ্ধবাদীরা কয়দিন বাঁচবে যারা একে অমান্য করে? কিন্তু আল্লাহ্‌র মনোনীত এই খিলাফত চলবে হাজার বছর। যারা এর ছায়াতলে নিজেদের সোপর্দ করবে তারা নৈরাজ্য, অশান্তি থেকে মুক্তি পাবে। আর যারা বিরোধিতা করবে অথবা এই মহামূল্য রত্ন পেয়েও ছেড়ে দিবে তারা নিজেরাই ধ্বংস হবে নিজেদের কারণে। পৃথিবীর অনেক দাম্ভিক রাষ্ট্র ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আহমদীয়া খেলাফতের যে "বিশ্বজাতি" তারা কেয়ামতকাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে। মুসলমানদের নিজেদের অবাধ্যতার কারণে তারা ধ্বংস হচ্ছে আর হতে থাকবে।

মানবজাতির সুরক্ষার জন্য হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সতর্ক করে বলেন, "সেই এক অদ্বিতীয় খোদা দীর্ঘকাল যাবৎ নিরব ছিলেন এবং তাঁর সামনে অনেক জঘন্য অন্যায় সংঘটিত হয়েছে এবং তিনি নিরবে সহ্য করে গেছেন। কিন্তু এখন তিনি রুদ্রমূর্তিতে স্বরূপ প্রকাশ করবেন। যার শোনার মত কান কাছে সে শুনে নিক, সে সময় দূরে নয়। আমি সকলকে খোদার আশ্রয়ের ছায়াতলে একত্র করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু ভবিতব্য পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। আমি সত্য সত্যই বলছি, এদেশের পালাও ঘনিয়ে আসছে। নূহের যুগের ছবি তোমাদের চোখের সামনে ভাসবে আর লুতের দেশের ঘটনাও তোমরা স্বচক্ষে দর্শন করবে। তবে খোদা শাস্তি প্রদানে ধীর; অনুতাপ কর, তোমাদের প্রতি করুণা প্রদর্শিত হবে। যে খোদাকে পরিত্যাগ করে, সে মানুষ নয়, কীট। যে তাঁকে ভয় করে না, সে জীবিত নয়, মৃত।" (হাকীকাতুল ওহী)

মুসলমানদের করণীয় বিষয় এখন একটিই। আর তা হলো যুগের ইমামকে মান্য করা, কেননা এর মাধ্যমেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের সন্তুষ্টি লাভ হবে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের শুভ বুদ্ধির উদয় ঘটান এবং সকলকে এক খেলাফতের ছায়াতলে আসার সৌভাগ্য দিন, আমীন।

মুয়াযযেম আহমদ সানী, চট্টগ্রাম

শান্তির নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামই প্রদান করে

বিশ্ব পরিস্থিতি আজ ভয়াবহ। কোথাও শান্তি নাই, সর্বত্র বিশৃঙ্খলা। যুলুম নির্যাতন, অন্যের সম্পদ হরণ, জবরদস্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল, কারণে অকারণে হত্যা, গুম, লুণ্ঠন, বিদ্রোহ এ সবই আজ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এটাই যেন স্বভাবিক, মানুষের বিবেক আজ মৃত। ন্যায় বিচারের আশা করা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দুরাশা মাত্র। সর্বত্র নৈরাজ্য। আর এর হোতারা আড়ালে আবডালে বসে কল কাঠি নাড়ছে এবং দিব্যি ভাল মানুষ সেজে নেতৃত্ব ও বিশ্ব নেতৃত্বের দখন দারিত্ব টিকিয়ে রাখার নব নব কৌশল আবিষ্কার করে চলেছে। সত্যকে চাপা দেওয়ার কৌশলে তারা পারদর্শী। কিন্তু সত্যকে কি চাপা দেওয়া যায়? সে কৌশল প্রকৃতি সম্মত নয়, সে কৌশল মানবতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নয় বরং মানবতাকে বলী দিয়ে বিশ্বের বেশীর ভাগ মানুষকে বঞ্চিত রেখে নিজেদের বিলাস বিভব কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার এক বর্বর অভিলাষ।

মুসলমান নামধারী অপরিনামদর্শী একটি অংশ ও নৃশংসতার নাম কুড়াচ্ছে ঠিকই কিন্তু তলিয়ে দেখছে না পরিণামে তারা বঞ্চিতই থেকে যাচ্ছে এবং কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে বহন করছে এবং জাতিকেও কলঙ্কিত করছে। শান্তির ধর্ম ইসলামকে, যদিও ইসলামে নৈরাজ্যের কোন স্থান নেই। "...আর তারা পৃথিবীতে নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছুটে বেড়ায়। আর আল্লাহ্ নৈরাজ্য সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ৬৬)। প্রকৃত মুসলমান কখনও নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হতে পারে না। বরং নৈরাজ্য প্রতিরোধ করাই প্রকৃত মুসলমানের দায়িত্ব। রাষ্ট্র সমাজ কোথাও আজ শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নেই। ব্যক্তি স্বার্থ ও গোষ্ঠি স্বার্থের চরিতার্থ করতে গিয়ে ব্যক্তি ও পশু শক্তিকে নিজেদের প্রভু বলে গ্রহণ করে নিয়েছে। ব্যক্তি স্বার্থ আজ সমষ্টিগত স্বার্থের (বিশ্ব-শান্তির) ওপরে স্থান করে নিয়েছে। বিশ্ব যে শৃঙ্খলার অধীন, প্রকৃতি যে শৃঙ্খলা অনুসরণ করে, মানুষ আজ সে শৃঙ্খলাকে পদদলিত করছে।

অথচ আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে কোথাও বিশৃঙ্খলা নেই। ধর্মধারীরা আজ ধর্ম নিয়ে পুতুল খেলছে। মোল্লা পুরোহিতরা আজ মতিভ্রম, নীতি ভ্রষ্ট। ধর্ম তাদের কাছে আজ খেলা তামাশা ও ব্যবসা এবং কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার, অন্ন বস্ত্রের ব্যবস্থাবলী। সর্বত্র সম্পদ ও মানবতার সুফল বন্টনের অভাব; এমনকি এর নীতি নির্ধারণে ও তারা অক্ষম। যে যার মতে নীতি নির্ধারণ করছে, পৃথিবীর সব মানুষের সুখী হওয়ার সূত্র কারো জানা নেই। মানুষ স্রষ্টা হতে দূরে, শুধু দূরেই নয়– তাঁকে ভুলেই বসেছে। আর তাই জল ও স্থল বিশৃঙ্খলায় ছেয়ে গেছে। মানুষ যতক্ষণ না তার স্রষ্টার দিকে প্রত্যাবর্তন করছে ততক্ষণ বিশ্ব-শান্তির আশা দুরাশা মাত্র। বিশ্ব ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকানো দরকার। নূহ (আ.), লূত (আ.), শোয়েব (আ.) এর যুগ–সব যুগ একত্র হয়ে একক ভাবে আমাদের সমাজে বিরাজ করছে। ভয়াবহ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ দ্বার প্রান্তে, বরং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। সব ধর্মের যাবতীয় সত্য সুন্দর ও নীতি নিয়েই সম্পর্কিত ও অনন্য একক ইসলাম যার অপর নাম শান্তি। পরিপূর্ণ শান্তির রূপরেখা চিরকাল ব্যাপী শান্তির নিশ্চয়তা একমাত্র ইসলামই আমাদের প্রদান করে। কিন্তু মুখের বুলি দিয়েই তো এই ইসলামের বিজয় সম্ভব নয় যতক্ষণ না আমরা একে সাধ্যাতীত জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি। পরিতাপের বিষয় যে মুসলমানরা তারা ক্ষুদ্র অংশ হলেও ইসলামের আদর্শ হতে বঞ্চিত। তাদের দ্বারা আজও ইসলাম আক্রান্ত।

এই যদি হয় অবস্থা তখন অন্যদেরই বা দোষ কি? এখন প্রশ্ন আসে এ অবস্থায় প্রকৃত মুসলমান হিসাবে আমাদের করণীয় কি? আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে আমরা এ যুগের সংস্কারক প্রতিশ্রুত মা'মুর ঈসা ইবনে মরিয়ম নামধারী উম্মতি নবী ইমাম মাহ্‌দী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.), যিনি প্রকৃত ইসলামী শিক্ষাকে বিশ্বে পুনঃস্থাপনের জন্য খাতামান নবীঈন হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্যে আল্লাহ্‌র আদেশে ন্যায় বিচারক মীমাংসাকারী ও ত্রিত্ববাদের অসারতা প্রমাণ কল্পে প্রকৃত সত্য ও সুন্দর এবং মানবতা ও তৌহিদের শিক্ষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইসলামের ছায়ায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পতাকাতলে বিশ্বকে সমবেত করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছেন তাকে গ্রহণ করেছি। তার আগমনে ন্যায় বিচার পদ্ধতিতে আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বে পবিত্র খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব আমাদের দায়িত্ব জোর নয়, লাঠিও নয় বরং নৈতিকতা ধারণ করে তার আদর্শ বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে খেলাফতের আনুগত্যে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর পতাকাতলে সমবেত করা।

আমাদের কর্তব্য সন্ত্রাস, নৈরাজ্য, যুলুম-নির্যাতন, খেয়ানত, অবাধ্যতা, ও বিদ্রোহের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, তবে তা সত্য ও সুন্দর প্রচারের মাধ্যমে। আল্লাহই আমাদের একমাত্র ভরসা। তিনিই সর্বশক্তির উৎস। দোয়াই আমাদের অস্ত্র। নিজ নিজ জীবনে আদর্শ স্থাপন করা এবং অন্যকে এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা এটাই জেহাদ। আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে আহমদীয়াতের তথা খাঁটি ইসলামের বাণী প্রত্যেকের কাছে পৌঁছানোর তৌফিক দান করুন। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই আমাদের প্রার্থনা।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর।

কোন ধর্মই সন্ত্রাসবাদ জঙ্গীবাদ ও নৈরাজ্যের শিক্ষা দেয় না

পৃথিবীতে নৈরাজ্য তো সৃষ্টি করে কেবল ধার্মিকরা, অধার্মিকরা নয়। তবে কোন ধর্মই সন্ত্রাসবাদ, জঙ্গীবাদ ও নৈরাজ্যের শিক্ষা দেয় না বা সমর্থনও করে না। তবে ভ্রান্ত মতবাদ অবলম্বীরা ধর্মের নামে নৈরাজ্যের পথ অবলম্বন করে সমাজে ও রাষ্ট্রে নৈরাজ্যকর অবস্থার সৃষ্টি করে এবং তারা মনে করে এসব ধর্মীয় কাজ এবং পুণ্যের কাজ। তবে পবিত্র ইসলাম ধর্মের দৃষ্টিতে এসব সম্পূর্ণ অবৈধ কর্মকাণ্ড এবং ইসলাম ধর্মের কলঙ্ক।

এরূপ পরিস্থিতিতে বলা যায় যে,

খিলাফত হীন খলীফা বিহীন
কভু নাহি চলে দ্বীন।
খিলাফত হারা খলীফা ছাড়া
ধর্ম কখনো থাকে না খাড়া,
তাই হয় সকলে পথ হারা
তবে কি করবে তারা
নৈরাজ্য ছাড়া?

মোটকথা পৃথিবী থেকে নৈরাজ্য উৎখাত করতে হলে প্রকৃত মুসলমানের করণীয় হচ্ছে, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা এবং মহানবী ও বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা ও তাঁর আদর্শ পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া।

হ্যা, এহেন কাজ একজন প্রকৃত মুসলমানের দ্বারাই সম্ভব। কেননা, একজন প্রকৃত মুসলমানের কাছেই রয়েছে মহানবী (সা.) অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা ও তাঁর আদর্শ এবং নানা গুণের বৈশিষ্ট্যাবলী।

তাই প্রকৃত মুসলমান ছাড়া এরূপ নৈরাজ্যের পথ পরিহার করার কথা সমাজে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং হতেও পারে না। এহেন পুণ্য ও মঙ্গলজনক বা কল্যাণকর কাজ মানুষ কখনো করতে সক্ষম হবে না যদি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য তার সঙ্গী না হয়। পরিশেষে দোয়া চাই, দোয়া করি, দোয়া হবে মহাতরী। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে নৈরাজ্যের পথ থেকে দূরে থাকার তৌফিক দান করুন, আমীন।

শেখ হেলাল উদ্দিন আহমদ, ঢাকা

আগামী পাঠক কলামের বিষয় 'পবিত্র ঈদুল ফিতরে আমাদের করণীয়'

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ জুন, ২০১৬-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-

ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com
masumon83@yahoo.com

সংবাদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌র ঢাকার উদ্যোগে তবলীগি সেমিনার ও সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৫ এপ্রিল শুক্রবার বাদ জুমুআ পলাশপুর হালকার উদ্যোগে জনাব সানী সাহেবের বাসায় অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন জনাব মাজেদুর রহমান ভূঁইয়া, নায়েব যয়ীম আলা, মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ ঢাকা। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ গোলাম মোর্তুজা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মওলানা মোহাম্মদ শাহাজালাল। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পাঠ করেন এস,এম, রহমতউল্লাহ্‌। বক্তৃতাপর্বে 'বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং আমাদের করণীয়' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা এনামুল হক। এরপর 'রসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সীরাত' সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পরিচিতি ও ধর্ম বিশ্বাস লিফলেট সকলের সামনে উপস্থাপন করা হয় এবং প্রায় ৬০টির মত পরিচিতি লিফলেট বিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে আগত মেহমানদের প্রশ্নের উত্তর ও মূল্যবান আলোচনা রাখেন মোবাল্লেগ ইনচার্জ মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। শেষে নসিহতমূলক বক্তব্য ও সমাপনী দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকা। উক্ত অনুষ্ঠানে ১০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

শফিকুল হাকিম আহমদ

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

মজলিস আনসারুল্লাহ্‌ নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে গত ২২/০৪/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব কাউসার আহমদ। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোস্তফা পাটোয়ারী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ। বাংলা নযম আবৃত্তি করেন জনাব শামীম আহমদ। বক্তৃতা পর্বে মহানবী (সা.)-এর জীবনাদর্শের ওপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব ডা. মুজাফফর উদ্দিন আহমদ, জনাব মইনউদ্দীন আহমদ এবং মওলানা নাবিদুর রহমান। প্রশ্নোত্তর শেষে সভাপতির জ্ঞানগর্ব বক্তৃতার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে কয়েকজন মেহমানসহ ১০২ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ সামছুল আলম

নূরনগর ঈশ্বরদী জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৬/০৪/২০১৬ তারিখ শুক্রবার বাদ জুমুআ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, নূরনগর ঈশ্বরদীতে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব আশরাফ আলী খান। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন তৌফিক জামান এবং নযম পাঠ করেন জনাব মুক্তার হোসেন। এরপর পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ আল হক এবং জনাব গিয়াস উদ্দিন মোল্লা। সবশেষে সভাপতির বক্তব্য ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এতে ২১ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান

তেরগাতী জামা'তে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৩/০৪/২০১৬ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত তেরগাতীর উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসার আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন জনাব মোহাম্মদ ফয়জুল্লাহ্‌, নায়েব আমীর-৪। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্বারী মোহাম্মদ ফজলুল হক। নযম পরিবেশন করেন জনাব আফজাল আহমদ ইয়াছিন। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। বক্তৃতা পর্বে মহানবী (সা.)-এর উত্তম আদর্শ নিয়ে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন, জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী, মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান এবং মওলানা রাসেল সরকার। শেষে 'হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর মদীনা সনদ' এর ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, মুবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ। এরপর বাংলা নযম পরিবেশন করেন দুর্জয় আহমদ। প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী। সভাপতির নির্দেশে সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় জামা'তের প্রেসিডেন্ট জনাব সৈয়দ আনোয়ার আলী। এতে ২৪০ জন উপস্থিত ছিলেন।

সৈয়দ আনোয়ার আলী

রিশতানাতা বিষয়ক সেমিনার

গত ১৪ এপ্রিল বাদ মাগরিব মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া নাটোর জেলার উদ্যোগে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তেবাড়িয়ার মসজিদ প্রাঙ্গনে রিশতানাতা বিষয়ক ও জামা'তী শিক্ষা বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জেলা কায়েদ জনাব হাফিজুর রহমান। কুরআন তেলাওয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। রিশতানাতা বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন মওলানা শরীফ আহমদ আফ্রাদ ও মওলানা সালাউদ্দিন আহমদ। এতে জামাতি শিক্ষা বিষয়ক এবং জামা'তের বাইরে বিয়ের কুফল সম্পর্কে আলোচনা হয়। শেষে প্রশ্ন উত্তরে খোদ্দাম ও আতফালরা বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। উল্লেখ্য যে উক্ত অনুষ্ঠানে স্থানীয় জামা'তের ৯০ জন উপস্থিত ছিলেন।

আল-আমিন হক তুষার

মজলিস আনসারুল্লাহ ঢাকার উদ্যোগে অসুস্থ্য ও বয়োজ্যেষ্ঠ আনসার ভাইদের সাথে সাক্ষাত

গত ৯ এপ্রিল, ২০১৬ মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঢাকা ও মজলিস আসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ এর উদ্যোগে যয়ীমে আলাসহ কয়েকজন নিম্নের আনসার ভাইদের খোঁজ-খবর নেয়ার জন্য তাদের সাথে বিশেষ সাক্ষাত করা হয়।

বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য- (১) জনাব আব্দুল কাদির ভুঁইয়া (মতিঝিল হালকা), (২) জনাব মোহাম্মদ হোসেন মিয়া (মাদারটেক হালকা) এবং অসুস্থ্য সদস্য (৩) জনাব সোহেল সাত্তার স্বপন (মাদারটেক হালকা)।

পহেলা বৈশাখে বিশুদ্ধ পানি পান

'হিউমিনিটি ফার্স্ট' প্রোগ্রামের অধীনে মজলিস আনসারুল্লাহ্, ঢাকার ১২ জন সদস্য সকাল ৮-৩০ মিনিট হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে শাহাবাগ চত্তরে আগত হাজার হাজার মানুষকে বিশুদ্ধ পানি পান করানো হয়। এতে খোদ্দামদের সাথে ১৭ জন আনাসারও অংশ নেয়।

শফিকুল হাকিম আহমদ

নারায়ণগঞ্জ জামা'তে মুসীয়ান সম্মেলন-২০১৬ অনুষ্ঠিত

গত ২৯/০৪/২০১৬ তারিখ রোজ শুক্রবার বাদ জুমুআ মিশন পাড়া মসজিদে মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনের শুরুতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব ডা. আসাদুজ্জামান। উদ্বোধনী ভাষণ ও দোয়া পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা পাটোয়ারী, আমীর, আহমদীয়া, মুসলিম জামা'ত, নারায়ণগঞ্জ। ওসীয়্যতের গুরুত্ব ও কল্যাণ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব ফজল মাহমুদ। ওসীয়্যত বিভাগের এক বছরের সার্বিক কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করেন জনাব শামিম আহমদ। এরপর প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে সভাপতির দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়। এতে সর্বমোট ৭৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

শামীম আহমদ

শৈলমারী জামা'তে মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত

গত ০৬/০৫/২০১৬ তারিখ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত শৈলমারীর উদ্যোগে মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান তাহাজ্জুদ নামায-এর মাধ্যমে আরম্ভ করা হয়। বিকাল পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে।উক্ত সম্মেলনে পাশের জামা'ত উথলী-সন্তোষপুর ও চুয়াডাঙ্গা থেকে ৮ জন উপস্থিত ছিলেন। এতে মোট ২৪ জন উপস্থিত ছিলেন। দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

প্রেসিডেন্ট

শোক সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার মুহাম্মদপুর হালকার প্রেসিডেন্ট এবং খোদ্দামুল আহমদীয়া ঢাকার নায়েব কায়েদ-১ ও আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের সহকারী ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত-১, এ, কে, এম আতাউল করিম জয়, গত ৪ঠা মে ২০১৬ তারিখে আকস্মিকভাবে শ্বাসকষ্ট ও হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন, (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মরহুমের পিতা এ,কে রেজাউল করিম এবং মাতা-মরহুমা শামসুন্নাহার করীম। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৯ বছর। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তিনি পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে ছোট। পিতামাতার ন্যায় তিনিও মুসী ছিলেন। তিনি মাঝে মধ্যে অসুস্থ হলেও কখনোই জামা'তের কাজে অপারগতা প্রকাশ করতেন না। তিনি অত্যন্ত সাহসী, স্পষ্টভাষী, ভদ্র-নম্র ও ঠান্ডা মেজাজের মানুষ ছিলেন। তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অন্যান্য মুসীদের সাথে আহমদী কবরস্থানে তার পিতা-মাতার কবরের পাশে সমাহিত করা হয়। আল্লাহ্ যেন মরহুমকে জান্নাতের উঁচু আসনে সমাসীন করেন এজন্য সকল আহমদী ভাই বোনদের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি। মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনায় তার ভাই-বোন ও তাদের ছেলেমেয়ে আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষ থেকে-

তাহ্‌মিদুর রেজা অনিক (ভাগ্নে)

খুলনায় ১০ম বার্ষিক মুসীয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, খুলনার উদ্যোগে মুসীয়ান সম্মেলন গত ৩০ এপ্রিল, ২০১৬ রোজ শনিবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিট হতে বিকাল ২-৩০ মিনিট পর্যন্ত দারুল ফজলস্থ বায়তুর রহমান মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোহাম্মদ সারোয়ার মোরশেদ, ন্যাশনাল সেক্রেটারী ওসীয়্যত। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ ওমর আলী এবং দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পরিবেশন করেন জনাব মুহাম্মদ মঞ্জুরুল আলম। উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি। উদ্বোধনী ভাষণে সভাপতি জামা'তের সকল সদস্যদের 'আল ওসীয়্যত' পুস্তকটি বেশী বেশী পাঠ করে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে সকলকে ওসীয়্যত করার জন্য বিশেষভাবে নসিহত করেন। এরপর খুলনা জামা'তের ওসীয়্যত বিভাগের সার্বিক কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করা হয়। এরপর স্থানীয় জামা'তের আমীর জনাব মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক ওসীয়্যতের গুরুত্ব এবং ওসীয়্যতকারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন। এরপর নসিহতমূলক বক্তব্য রাখেন মওলানা খুরশিদ আলম। দোয়ার মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়। সম্মেলনে ৪৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

জি এম মোশফিকুর রহমান

মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ওয়াকারে আমল

বাংলা নববর্ষ ১৪২৩ পদার্পণ উপলক্ষে গত ১লা বৈশাখ-১৪২৩ বঙ্গাব্দ (১৪ই এপ্রিল ২০১৬) তারিখ মোতাবেক রোজ বৃহস্পতিবার বাদ ফজর মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার উদ্যোগে এক বিরাট ওয়াকারে আমল প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। বাদ ফজর মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ-এ দোয়া করার পর ওয়াকারে আমল আরম্ভ হয়। দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা জহির উদ্দিন আহমদ। মসজিদ বায়তুল ওয়াহেদ ও আশপাশ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌরসভার ১০নং ওয়ার্ড এর কান্দিপাড়া (অধিকাংশ), ৯নং ওয়ার্ড (একাংশ) এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে ওয়াকারে আমল সফল কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়। রেলওয়ে স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ওয়াকারে আমলের পূর্ব অনুমতি দেন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের যুবকদের এ সমস্ত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে প্রশংসা করেন ও সহযোগিতা করেন। এই ওয়াকারে আমলের ফলে রেলস্টেশনের পাশাপাশি এলাকায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পক্ষে ব্যাপক সাড়া পড়ে এবং একটি উজ্জলময় চিত্র প্রকাশ পায়।

আতাই রাব্বি

৮ম বার্ষিক স্থানীয় কর্মশালা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অনুষ্ঠিত

গত ৯ এপ্রিল, ২০১৬, রোজ শনিবার স্থানীয় মজলিস আনসারুল্লাহ্, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কর্মশালা স্থানীয় বায়তুল ওয়াহেদ মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার প্রথম পর্ব সকাল ৯টা হতে বেলা ১০-৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে। ১ম পর্বের এই অনুষ্ঠান জনাব রিজিওনাল নাযেম-এর সভপতিত্বে আরম্ভ হয়। জনাব নাসির আহমদ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং সভাপতির আহাদ পাঠ ও দোয়ার পর আলোচনা পর্ব শুরু হয়। এতে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন জনাব আল-আমীন আহমদ, জনাব মোহাম্মদ মঞ্জুর হোসেন এবং জনাব শেখ মোশারফ হোসেন।

২য় পর্বে কর্মকর্তাদের সকল বিভাগের দায়িত্ব কর্তব্য হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেন জনাব শেখ মোশারফ হোসেন, জনাব আল-আমীন আহমদ, জনাব মোশারফ হোসেন এবং জনাব আবু তালেব। সবশেষে সভাপতির আহাদ পাঠ ও দোয়ার মাধ্যমে কর্মশালা সমাপ্ত হয়।

মোহাম্মদ আবু তালেব

আনসারুল্লাহ্‌র মিলনমেলা সফলতার সাথে সমাপ্ত

গত ১১ মার্চ, শুক্রবার মজলিস আনসারুল্লাহর ৯ম মিলনমেলা ধামরাইয়ের মহিশাষী মোহাম্মদী গার্ডেনে আয়োজন করা হয়। ইজতেমায়ী দোয়ার মাধ্যমে মিলনমেলায় অংশগ্রহণকারীদের যাত্রা শুরু হয় দারুত তবলীগ বকশী বাজার থেকে, রাজধানীর বিভিন্ন স্থান থেকে ৬টি বড় বাস একত্রিত হয় মানিক মিয়া এভিনিউতে। এরপর যাত্রা শুরু হয় এবং সেই সাথে সকালের নাস্তাও। আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, নাসেরাত, তিফল সবাই ছিল এই মিলনমেলায়। মিলনমেলা স্থলে পৌঁছে প্রায় ১১ টায়। এরপর শুরু হয় মিলনমেলার আনুষ্ঠানিকতা, অনুষ্ঠানের সঞ্চালক জনাব মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম মিঠু সালাম জানিয়ে ষ্টেজের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজ নিজ আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেন। কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন জনাব মোহাম্মদ এনামুল হক। এরপর সদর আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশ জনাব আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী সংক্ষিপ্তভাবে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন। ঢাকা আনসারুল্লাহ্'র যয়ীমে আলা জনাব শফিকুল হাকিম আহমদও তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে সকলকে শুভেচ্ছা জানান। এরপর শুরু হয় খেলাধূলা, খেলাধূলার পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সাবেক যয়ীমে আলা জনাব নাসির উদ্দিন মিল্লাত, জনাব মসিহ্ উর রহমান ও জনাব খালেদ বিন কাশেম। বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণকারী খোদ্দাম, আতফাল ও আনাসারগণ খুবই আনন্দ উপভোগ করেন।

জুমুআর নামাযের আযান হলে নামাযের জন্য সবাই তৈরী হয়ে গাছের ছায়ায় নির্ধারিত স্থানে একত্রিত হয়। পূর্বেই পর্দা টানিয়ে লাজনাদের নামাযের জায়গা বানানো হয়েছিল। দুপুর দেড়টায় আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ খুতবা শুরু করেন। যথাসময়ে নামায শেষ হয়। তারপর খাবার পরিবেশন হয়। শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সর্ববয়োজ্যেষ্ঠ ও সর্বকণিষ্ঠ অংশগ্রহণকারীকেও পুরস্কৃত করা হয়। সবশেষে যয়ীমে আলার সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে মিলনমেলা সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে আনসার, খোদ্দাম, লাজনা, নাসেরাত ও আতফালসহ প্রায় চারশ জন অংশ নেন।

মোহাম্মদ আবু তাহের দুলাল

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবার সংক্ষিপ্তরূপ

গত শুক্রবার ২০ মে, ২০১৬ হুযূর আনোয়ার (আই.) সুইডেনের গোথেনবার্গে অবস্থিত নাসের মসজিদে প্রদত্ত জুমুআর খুতবার শুরুতে সূরা নূরের ২২ নাম্বার আয়াত পাঠ করেন যার অর্থ হলো, **হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। আর যে-ই শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে (তার জানা উচিত) নিশ্চয় সে অশ্লীলতা ও অপছন্দনীয় কাজের আদেশ দেয়। আর তোমাদের ওপর আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও তাঁর কৃপা যদি না হতো তাহলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হ'তে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে চান পবিত্র করেন। আর আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা (ও) সর্বজ্ঞ।**

এরপর হুযুর (আই.) বলেন, এ আয়াত ছাড়াও আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের অন্যত্রও শয়তানের নির্দেশ না মানার বিষয়ে বিশ্বাসীদের তাকিদ দিয়েছেন। কেননা, শয়তান আল্লাহ্‌র আদেশের বিরোধিতা করে এবং বিদ্রোহ করে। তাই যারা তাকে অনুসরণ করে তাদেরও সে বিদ্রোহের শিক্ষাই দেয়। শয়তান জাহান্নামের ইন্ধন আর যারা তাকে অনুসরণ করে তাদেরকেও জাহান্নামের ইন্ধন বানিয়ে দেয়।

উপরোক্ত আয়াতের আলোকে আল্লাহ্ বলেন, তারপরও কি তোমরা এটা বুঝতে পার না যে, শয়তান তোমাদের চরম শত্রু! অনেকে আছে যারা ধর্ম বোঝে না, বোঝার চেষ্টাও করে না। আবার অনেকে এমনও রয়েছে যারা পবিত্র কুরআন শুধুমাত্র আপত্তি খুঁজে বের করার জন্য পাঠ করে আর এর উৎকর্ষ গুণাবলী থেকে লাভবান হয় না এবং শয়তানের কবল থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে না। এছাড়া এমন লোকও আছে যারা নিজেদের মু'মিন বলে আখ্যা দেয়ার পরও নির্বুদ্ধিতার কারণে অথবা জ্ঞানের অভাবে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

এ আয়াতে মু'মিনদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে চিন্তামুক্ত হয়ে যেও না, বরং মৃত্যুকাল পর্যন্ত শয়তানের আক্রমনের আশংকা রয়েছে। শয়তান যেভাবে সাধারণ মানুষকে পথভ্রষ্ট করে সেভাবে মু'মিনকেও পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম।

এ বিষয়ে নসীহত করতে গিয়ে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এ কারণে মানুষের উচিত সে যেন সব সময় আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখে। কেননা, শয়তান সৃষ্টির প্রথম দিনই বলেছিল, সে মানব জাতিকে পথভ্রষ্ট করার লক্ষ্যে পথের প্রতিটি মোড়ে ওঁৎপেতে বসে থাকবে এবং অধিকাংশ মানুষ তাকে অনুসরণ করবে।

এরপর হুযুর (আই.) সূরা নিসা'র ৯৪ নাম্বার আয়াতের **(ওয়া মাঈয়াক্বতুল মু'মিনান মুতাআম্মিদান ফা জাযাউহু জাহান্নাম)** উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, বর্তমানে মুসলমান বিশ্বে যা কিছু ঘটছে এসব কি? ইসলামের নামে এক মুসলমান অপর মুসলমানকে হত্যা করছে অথচ পবিত্র কুরআনে এর বিপরীত নির্দেশ রয়েছে। আজ কট্টরপন্থীদের পক্ষ হতে মুসলমানকে হত্যার প্রতিদানে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হচ্ছে। অথচ আল্লাহ্ বলেছেন এর পরিণাম 'জাহান্নাম'। বস্তুতঃ এটি শয়তানের প্রতিশ্রুতি।

হুযূর (আই.) বলেন, এ কারণেই সব সময় আল্লাহ্‌কে স্বরণ রাখতে বলা হয়েছে। শুধু চরমপন্থীরাই নয় বরং কোন মানুষ যখন আল্লাহ্‌র ছোট-খাটো আদেশও অমান্য করে, প্রকৃতপক্ষে সে ধীরে ধীরে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে আরম্ভ করে। এ জন্যই অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন এবং আত্মবিশ্লেষণ করা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য আবশ্যক।

হুযূর (আই.) আরো বলেন, যারা অন্যায় এবং ব্যাভিচারে লিপ্ত তাদের ওপর শয়তানের রাজত্ব প্রকাশ্য বিষয়। কিন্তু ঈমানদার হওয়ার দাবিকারকদের যদি শয়তান প্ররোচিত করে তবে তা বোঝা সহজ কাজ নয়, কেননা সে যখনই পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে তখন পুণ্যের মাধ্যমেই করে। পুণ্যের বেশ ধরেই সে মানুষের সর্বনাশ করে। হযরত আদম (আ.)-কেও সে পুণ্যের প্রলোভন দেখিয়েই অন্যায়কর্মে বাধ্য করেছিল।

এরপর হুযূর (আই.) পর্দা বলেন, বাহ্যতঃ অনেক খারাপ জিনিস বা অপরাধ ক্ষুদ্র মনে হলেও যখন তা সার্বজনীন রূপ পরিগ্রহ করে তখন অনেকে সে অপরাধের ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে রাখে, অনেকে আবার হীনমন্যতার কারণে চুপ করে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ সমাজে পর্দাকে কটু দৃষ্টিতে দেখা হয়। যারফলে অনেক আহমদী মেয়ে হীনমন্যতায় ভোগে আর পর্দার ক্ষেত্রে শৈথিল্য দেখায়। শয়তান প্ররোচনা দেয়, পর্দা একটি নগণ্য বিষয়, এটি ছেড়ে দেয়া কোন বড় অপরাধ নয়, এটি ছাড়া অন্যান্য সব ইসলামী আদেশ-নিষেধ তো তুমি মেনে চলছই। এভাবে সহানুভূতির ছলে সে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে। এক্ষেত্রে আমাদের মেয়েরা একথাটি ভুলে যায় যে, পর্দার আদেশ পবিত্র কুরআনে রয়েছে, তাই কোনভাবেই তা উপেক্ষা করা সম্ভব নয়।

তিনি আরো বলেন, তবে, এমন মেয়েও রয়েছে যারা পর্দা বিদ্বেষীদের কড়া জবাব দেয় আর বলে, আমরা কোন পোষাক পড়বো বা না পড়বো এটি আমাদের নিজস্ব ব্যাপার। তোমরা আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার কে? অতএব যেখানেই থাকুন না কেন হীণমন্যতায় ভোগার কোন কারণ নেই। এসব দেশের বাবা-মায়ের উচিত তাদের সন্তানদের বলা যে, ইসলামের আদেশ মান্য করার মধ্যেই প্রকৃত সম্মান নিহিত।

একইভাবে ছেলেরাও ছোট-ছোট পাপে লিপ্ত হয় এবং ধীরে ধীরে বড় পাপে জড়িয়ে পড়ে। বাইরে বন্ধু-বান্ধবদের সাথে খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যায়। বাবা-মা'র উচিত সন্তানদের সাথে বন্ধুত্বসূলভ সম্পর্ক গড়ে তোলা। ঘরে ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা যাতে ঘরে শান্তি বিরাজ করে তাহলে সন্তানরা আর বাইরে গিয়ে শান্তি খুঁজবে না। এরপর বাবা-মায়ের দায়িত্ব হবে, সন্তানদের মসজিদমুখী করা। আর অঙ্গসংগঠেনের দায়িত্ব হচ্ছে তাদেরকে সামলানোর জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

হুযূর (আই.) আরো বলেন, শয়তান জানে মানুষ যতক্ষণ আল্লাহ্‌র আশ্রয়ে রয়েছে সে তাকে পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবে না, তাই সে সব সময় মানুষকে আল্লাহ্‌র সুরক্ষিত দূর্গ থেকে বের করার জন্য পুণ্যের প্রলোভন দেখিয়ে থাকে।

এরপর হুযুর (আই.) নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার বিষয়ে হাদিসের বরাতে বলেন,

নারী-পুরুষের কখনও নিভৃতে সাক্ষাত করা বৈধ নয়। কেননা, শয়তান মানুষের শিরা উপশিরায় রক্তের মত প্রবহমান। এ সমাজে প্রত্যেকের বিশেষভাবে এদিকে খেয়াল রাখা উচিত, যেখানে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে একটি সাধারণ বিষয় মনে করা হয়।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, অধিকাংশ মানুষ অনেক রাত পর্যন্ত টিভি অথবা ইন্টারনেটে সময় কাটায়, আর সকালে ফজরের নামায পড়ে না। এমন মানুষ প্রকৃতপক্ষে নামাযের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। অথচ নামায সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস এবং সময়মতো নামায পড়া প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক।

এরপর হুযূর শয়তানের খপ্পর থেকে বাঁচার জন্য দোয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর একটি দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের দোয়া শিখিয়েছেন যে, হে আমাদের আল্লাহ্! আমাদের হৃদয়সমূহে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দাও। আমাদের সংশোধন করে দাও এবং আমাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করো। আমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে আলোর পানে নিয়ে যাও। এবং আমাদেরকে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অশ্লীলতা হতে রক্ষা করো। আর আমাদের জন্য আমাদের কর্ণসমূহে, চোখে, হৃদয়ে এবং আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মাঝে কল্যাণ নিহিত রাখো। আমাদের প্রতি দয়ার দৃষ্টি দাও কেননা; তুমিই তওবা গ্রহণকারী এবং পরম দয়াময়। এবং আমাদেরকে নিয়ামতের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী এবং তা স্মরণকারী এবং গ্রহণকারী বানাও। হে আল্লাহ্! আমাদের ওপর তোমার নিয়ামতরাজিকে সম্পূর্ণ করো।

এরপর হুযূর তওবা ও ইস্তেগফার সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর রচনাসমগ্র হতে বিভিন্ন অংশ পাঠ করেন। তিনি বলেন, আমাদের সদা-সর্বদা দোয়া ও ইস্তেগফার করতে থাকা উচিত যাতে শয়তানের আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। ইস্তেগফারের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য ইস্তেগফারের ব্যবস্থা করিয়েছেন। অর্থাৎ মানুষ যেন প্রত্যেক পাপের জন্য তা বাহ্যিক হোক বা আভ্যন্তরীণ, সে তার জ্ঞান রাখুক বা না রাখুক, এবং তার হাত, পা, জিহ্বা, নাক, কান ও চোখ মোটকথা সব ধরনের গুনাহ্ থেকে যেন ইস্তেগফার করতে থাকে। আজকাল আদম (আ.)-এর দোয়া পাঠ করা উচিত অর্থাৎ, হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমরা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছি তুমি যদি আমাদের প্রতি দয়া না করো এবং আমাদের ক্ষমা না করো তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবো।

হুযূর বলেন, কোন উচ্চবাচ্য ছাড়াই আল্লাহ্‌র কথা পূর্ণরূপে মেনে চলার চেষ্টা করুন এবং কুরআনের শিক্ষামালা মেনে উন্নত মানে অধিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাঁর প্রতি সমর্পিত থাকার এবং শয়তানের পদাঙ্গ অনুসরণ থেকে মুক্ত থাকার তৌফিক দিন, আমীন।

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকী

বজ্রপাত থেকে বাঁচতে করণীয়

বাংলাদেশে প্রতি বছর বজ্রপাতে গড়ে দুই থেকে তিনশ' মানুষের প্রাণহানি ঘটে। গত বৃহস্পতিবার (১২ মে, ২০১৬) দেশের বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে ৪৪ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। এছাড়া গত শুক্রবারও বিভিন্ন জায়গায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছে। যেহেতু মার্চ থেকে মে এবং অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বজ্রবৃষ্টি হয়ে থাকে। তাই এ সময় পাকা বাড়ির নিচে আশ্রয় নিতে এবং উঁচু গাছপালা বা বিদ্যুতের লাইন থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। শুধু তাই নয়, এ সময় জানালা থেকে দূরে থাকার পাশাপাশি ধাতব বস্তু এড়িয়ে চলা, টিভি-ফ্রিজ না ধরা, গাড়ির ভেতর অবস্থান না করা এবং খালি পায়ে না থাকারও পরামর্শ দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা।

বজ্রপাতের সময় কী করা উচিত, আর কী উচিত নয়- সে বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এগুলো হলো-

ঘন ঘন বজ্রপাত হতে থাকলে খোলা বা উঁচু জায়গায় না থাকাই ভালো। সবচেয়ে ভালো হয় যদি কোনও দালানের নিচে আশ্রয় নেওয়া যায়।

বজ্রপাত হলে উঁচু গাছপালা বা বিদ্যুতের খুঁটিতে বিদ্যুৎস্পর্শের সম্ভাবনা বেশি থাকে। তাই বজ্রঝড়ের সময় গাছ বা খুঁটির কাছাকাছি থাকা নিরাপদ নয়। ফাঁকা জায়গায় যাত্রী ছাউনি বা বড় গাছে বজ্রপাত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অত্যন্ত বেশি।

বজ্রপাতের সময় বাড়িতে থাকলে জানালার কাছে গিয়ে উঁকিঝুঁকি নিরাপদ নাও হতে পারে। এ সময় জানালা বন্ধ রেখে ঘরের ভেতরে থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।

বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ করা ঠিক হবে না। এমনকি ল্যান্ড ফোন ব্যবহার না করতেও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বজ্রপাতের সময় এগুলোর সংস্পর্শে এসে অনেকে স্পৃষ্ট হন।

বজ্রপাতের সময় বৈদ্যুতিক সংযোগযুক্ত সব ধরনের যন্ত্রপাতি এড়িয়ে চলা উচিত। টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি বন্ধ করা থাকলেও স্পর্শ করা ঠিক হবে না। বজ্রপাতের আভাস পেলে আগেই প্লাগ খুলে রাখা ভালো।

বজ্রপাতের সময় রাস্তায় গাড়িতে থাকলে যত দ্রুত সম্ভব বাড়িতে ফেরার চেষ্টা করতে বলেছেন আবহাওয়াবিদরা। যদি তখন প্রচণ্ড বজ্রপাত ও বৃষ্টি হয়, তাহলে গাড়ি কোনও বারান্দা বা পাকা ছাউনির নিচে রাখা যেতে পারে। ওই সময় গাড়ির কাচে হাত দেওয়াও বিপজ্জনক হতে পারে।

বৃষ্টি হলে রাস্তায় পানি জমতে পারে। অনেক সময় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ি সেই পানিতে পড়ে হতে পারে দুর্ঘটনার কারণ। কাছে কোথাও বাজ পড়লেও সেই পানি হয়ে উঠতে পারে বিদ্যুতস্পৃষ্টের কারণ।

বজ্রপাতের সময় চামড়ার ভেজা জুতা বা খালি পায়ে থাকা খুবই বিপজ্জনক। যদি একান্ত বের হতেই হয়, পা ঢাকা জুতো ব্যবহার করা ভালো। রাবারের গামবুট এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো কাজ করবে।

বজ্রপাতের সময় রাস্তায় চলাচলেও খেয়াল রাখতে হবে। কেউ আহত হয়ে থাকলে দেরি না করে তাকে হাসপাতালে পাঠানোর চেষ্টা করতে হবে। তবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট কাউকে ঘটনার সময় খালি হাতে স্পর্শ করলে নিজেও ঝুঁকিতে পড়তে হবে।

(সূত্রঃ আমাদের সময়)

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

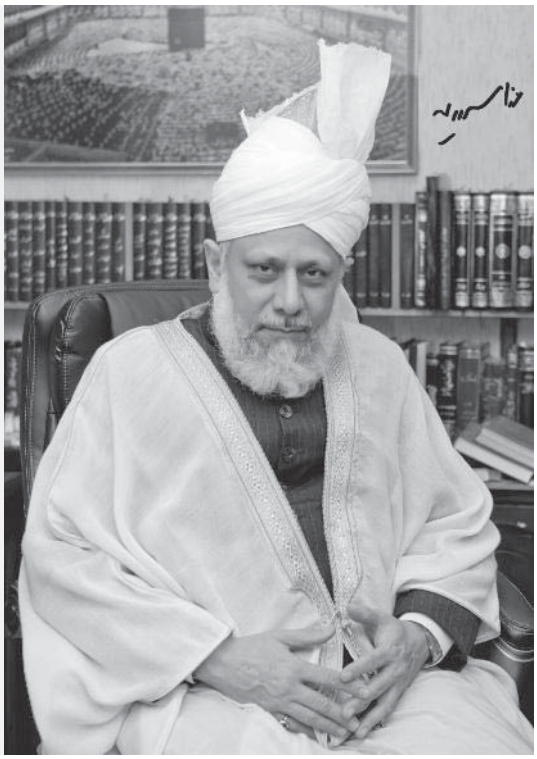

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহযোগী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 22 Issue
The Ahmadi Fortnightly Since 1922
31st May, 2016 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমুত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগেই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

“দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হার্দাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা’বা মেরা য়্যাহী হ্যা”

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা’বা এটাই।
–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

Muslim TV AHMADIYYA International

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ০১৭১৬-২৫৩২১৬

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৬.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৪.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 57300808, 57300849, Fax: 0088-2-57300880, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com